বিজয় দিবস সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০১৮ ▪ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৫

সচিত্র বাংলাদেশ

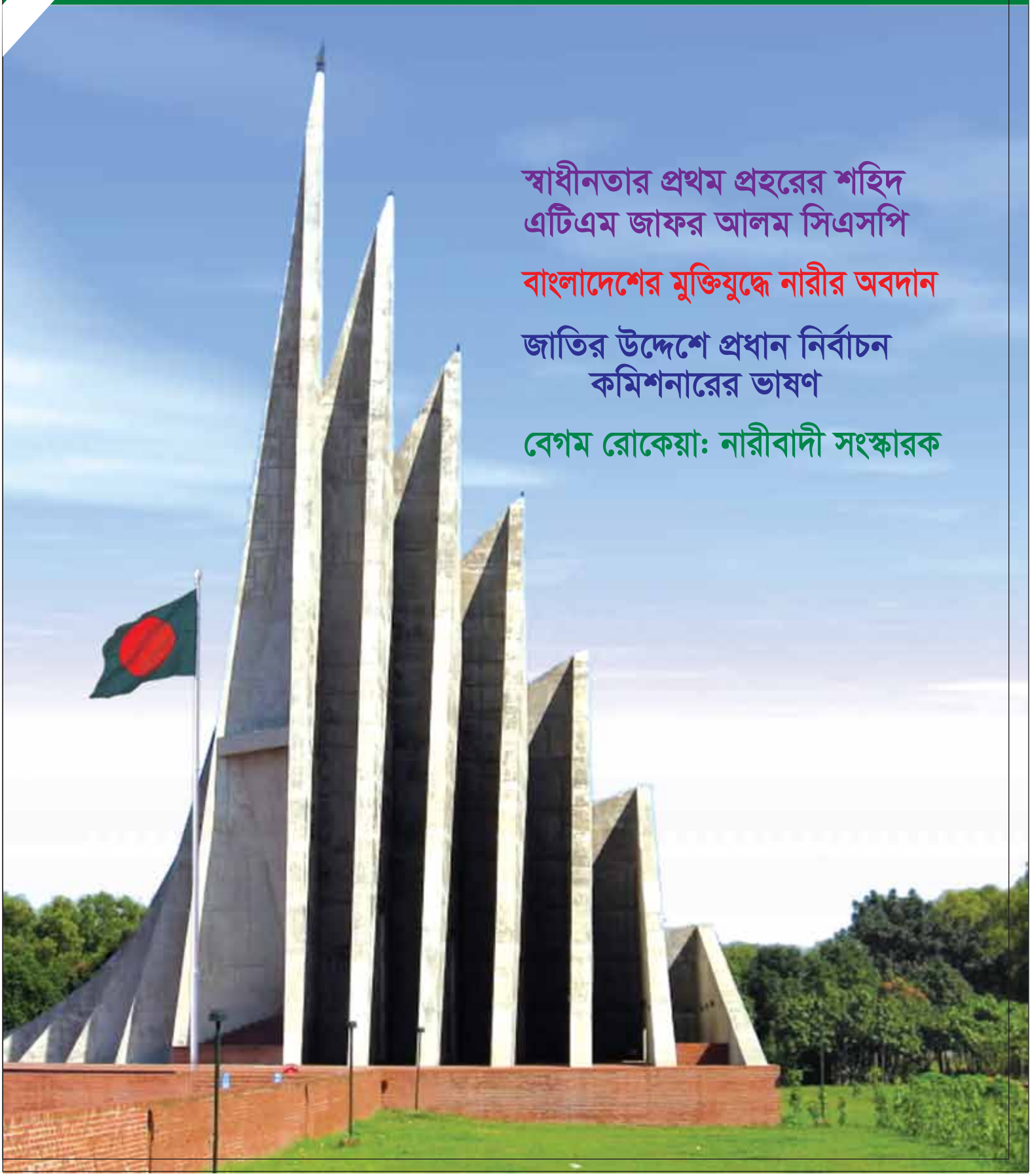

স্বাধীনতার প্রথম প্রহরের শহিদ এটিএম জাফর আলম সিএসপি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান

জাতির উদ্দেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষণ

বেগম রোকেয়া: নারীবাদী সংস্কারক

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

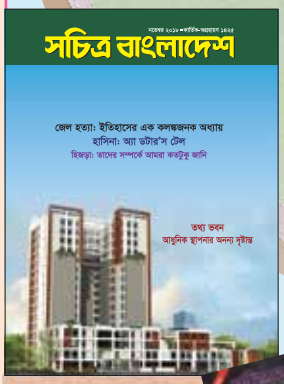

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

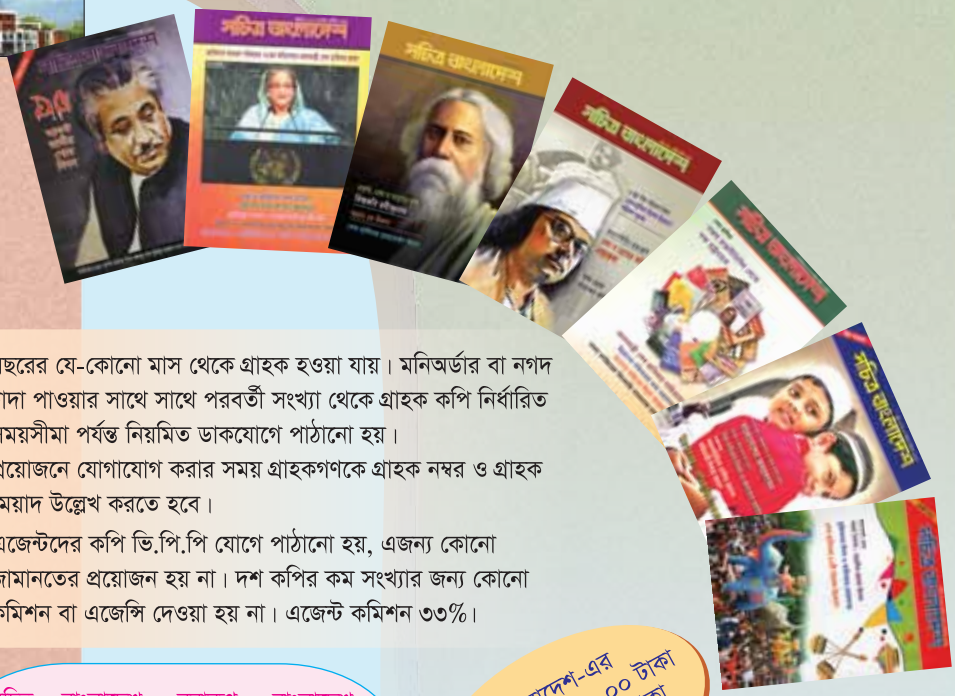

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : **bangladeshquarterly@yahoo.com**
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 39, No. 06, December 2018, Tk. 25.00

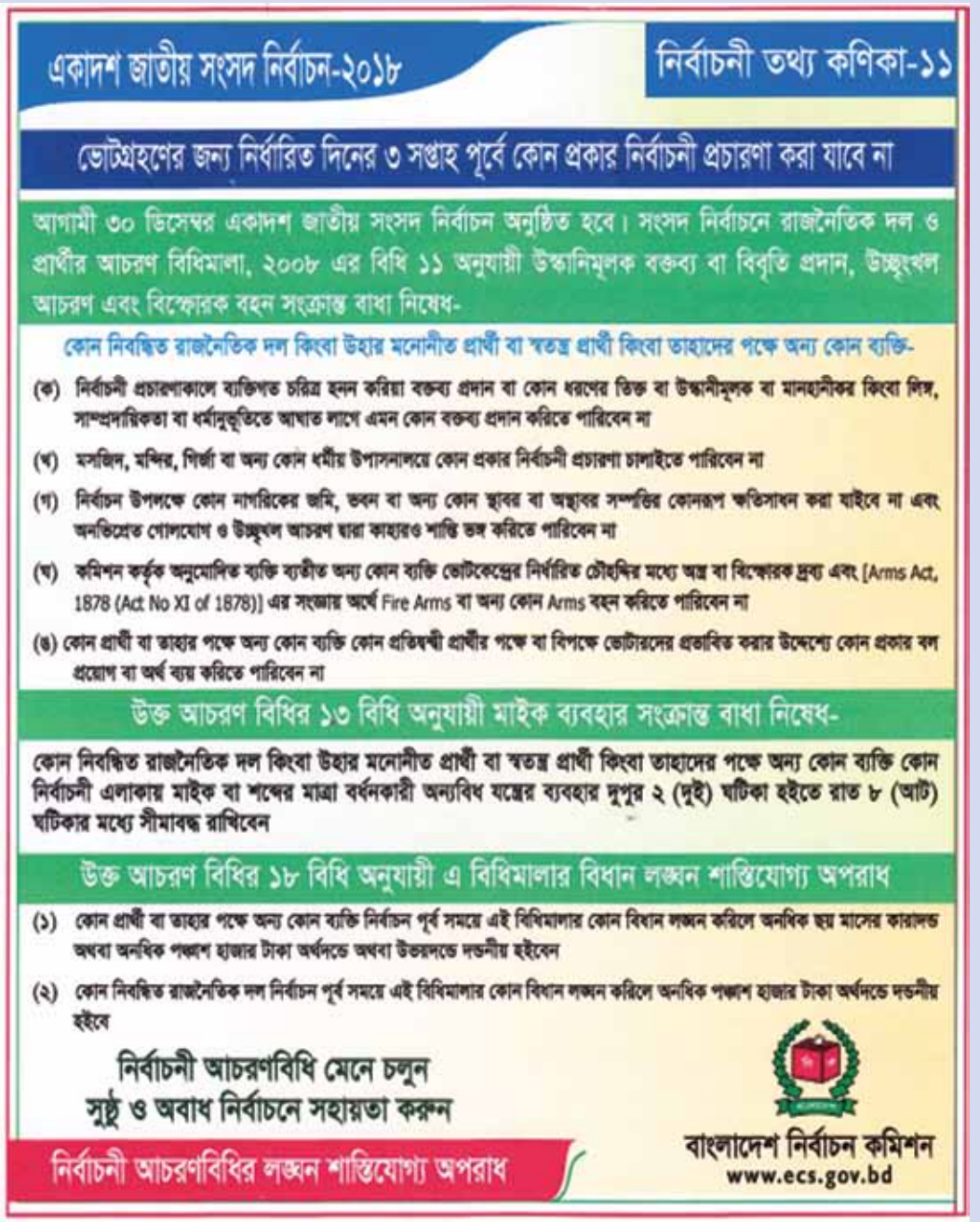

DFP
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ২০১৮ ❑ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৫

রায়েরবাজার বধ্যভূমি

সম্পাদকীয়

ষোলোই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর নেতৃত্বে ৯২ হাজার পাকসেনার আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীনতা অর্জনে আমাদের চরম মূল্য দিতে হয়েছে। ২৫শে মার্চের কালরাত থেকে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাসে আমরা হারিয়েছি ৩০ লক্ষ তাজা প্রাণ, ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম, জাতির বিবেক– শহিদ বুদ্ধিজীবীদের। বিজয়ের এই ৪৮তম দিবসে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের বীর সেনানীদের এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। যুদ্ধের ভয়াবহতা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে বিস্তর। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা, স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর অবদান, বৈশ্বিক পটভূমিকায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান– এসব বিষয় নিয়ে দেশের স্বনামধন্য লেখকবৃন্দ কী ভাবছেন *সচিত্র বাংলাদেশের* এ সংখ্যায় তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

৩০শে ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচনের সার্বিক বিষয় নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদার জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণটি এ সংখ্যার বিশেষ সংযোজন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর অসীম সাহসিকতা, দূরদর্শিতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এ দেশের আপামর জনসাধারণ পেয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মানবিক তাগিদ ও অনুপ্রেরণা। তাঁর জীবনীভিত্তিক গ্রাফিক নভেল *মুজিব* জাপানি ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নবম জাতীয় সংসদে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতাসমূহ নিয়ে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে 'নবম জাতীয় সংসদ: বক্তৃতা সমগ্র'। এ বিষয়ে সংখ্যাটিতে রয়েছে নিবন্ধ।

বাঙালি নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী ৯ই ডিসেম্বর। সমাজ সংস্কারক হিসেবে তাঁর ভূমিকা নিয়ে রয়েছে বিশেষ নিবন্ধ।

এছাড়াও থাকছে এমু চাষ ও পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়ন-কৌশল নিয়ে ফিচার, গল্প, কবিতা এবং অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ। আশা করি, সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম
নাফেয়ালা নাসরিন

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক), ৯৩৩২১২৯
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর; স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ

স্বাধীনতার প্রথম প্রহরের শহিদ এটিএম জাফর আলম সিএসপি ৪
মোহাম্মদ শফিউল আলম

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও আমাদের বিজয় ৬
শামসুজ্জামান খান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান ৮
সেলিনা হোসেন

বৈশ্বিক পটভূমিকায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ ১০
মফিদুল হক

বাংলাদেশ: বাংলাদেশে প্রথম বিজয় বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ-১৯৭২ ১২
খালেক বিন জয়েনউদদীন

জাতির উদ্দেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষণ ১৫

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: তফসিল ঘোষণা ও মনোনয়ন ১৭
কে সি বি তপু

বাংলাদেশের গণহত্যা: একটি রক্তাক্ত পতাকা ১৯
বদরু মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান

মুক্তিযুদ্ধের মঞ্চ নাটক ২১
মিজানুর রহমান মিথুন

একাত্তরের বুদ্ধিজীবী হত্যা: নরপশুদের অপকীর্তি ২৩
মো. রুহুল আমিন

বেগম রোকেয়া: নারীবাদী সংস্কারক ২৪
আফতাব চৌধুরী

বিজয় দিবসের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ২৫
মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

মরমি শিল্পী মমতাজ আলী খান ২৭
মিয়াজান কবীর

বিজয় দিবসের মহিমা ২৯
সোহরাব আহমেদ

গ্রাফিক নভেল মুজিব: জাপানি ভাষায় ৩০
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অমর স্বদেশপ্রেমিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৩১
ম. মীজানুর রহমান

এমু পালনে বাংলাদেশের সম্ভাবনা ৩৪
মো. আতিকুর রহমান মুফতি

হাইলাইটস

দলিত ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: উন্নয়ন কৌশল ৩৬
আজহারুল আজাদ জুয়েল

গল্প

দহন ৩৮
ইফফাত আরা দোলা

মুক্তিযুদ্ধ আমার গর্ব ৪২
জসীম আল ফাহিম

কবিতাগুচ্ছ ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৪১
কাজী রোজী, মোশাররফ হোসেন ভূঞা
সোহরাব পাশা, মনসুর জোয়ারদার
বাতেন বাহার, শাহ আলম বাদশা
জাকির হোসেন চৌধুরী, অঞ্জনা সাহা
জায়েদুল আলম, লিলি হক, রুস্তম আলী
নাহার আহমেদ, সাঈদ তপু, মুহাম্মদ ইসমাঈল
আবু তৈয়ব মুছা, সাঈদ কামরুল

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৪
প্রধানমন্ত্রী ৪৫
তথ্য মন্ত্রণালয় ৪৭
জাতীয় ঘটনা ৪৮
আন্তর্জাতিক ৪৯
উন্নয়ন ৫০
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫১
শিক্ষা ৫২
শিল্প-বাণিজ্য ৫৩
নারী ৫৩
কৃষি ৫৫
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৬
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৬
নিরাপদ সড়ক ৫৭
যোগাযোগ ৫৮
মাদক প্রতিরোধ ৫৮
স্বাস্থ্যকথা ৫৯
প্রতিবন্ধী ৫৯
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬০
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬১
সংস্কৃতি ৬১
চলচ্চিত্র ৬২
ক্রীড়া ৬৩
বিশ্বজুড়ে ডিসেম্বর: স্মরণীয় ও বরণীয় ৬৪

স্বাধীনতার প্রথম প্রহরের শহিদ এটিএম জাফর আলম সিএসপি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস একটি রক্তাক্ত ইতিহাস। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ কালরাত থেকে ১৬ই ডিসেম্বর– ৯ মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশে যে হত্যাযজ্ঞ চলে তার নজির বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাত থেকে পাক হানাদারবাহিনী এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড শুরু করে। এ রাতে ঘাতকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) অতর্কিত হামলা চালালে শহিদ হন ২০০ ছাত্র। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু তাহের মোহাম্মদ জাফর আলম, সংক্ষেপে এটিএম জাফর আলম সিএসপি। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরের শহিদ তিনি। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনী সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেছেন মোহাম্মদ শফিউল আলম বিশেষ নিবন্ধে। পড়ুন, পৃষ্ঠা–৪

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও আমাদের বিজয়

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মাত্র নয় মাসে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। মুক্তিযুদ্ধ ২৫শে মার্চ থেকে শুরু হলেও এর পটভূমিগত ইতিহাস আরো দীর্ঘ, আরো ব্যাপক। তাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের যথাযথ পর্যালোচনার তাগিদ আমরা খুঁজে পাই শামসুজ্জামান খানের বিশেষ নিবন্ধে। দেখুন, পৃষ্ঠা–৬

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল আপামর জনতার সংগ্রাম। এ যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও তাদের সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করেছিল স্বাধীনতা অর্জনে। সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছাড়াও গেরিলা যুদ্ধে রেকির ভূমিকা পালন, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে রান্না করা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও সেবিকা হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন দূতাবাসে প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তাদের অর্জন সেভাবে উঠে আসেনি। এ বিষয়ে সেলিনা হোসেনের বিশেষ প্রবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা–৮

বৈশ্বিক পটভূমিকায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পদানত জাতির মুক্তির প্রশ্ন পরিণত হয় বাস্তব এজেন্ডায়। একে একে স্বাধীন হতে থাকে উপনিবেশ রাষ্ট্রসমূহ। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটলেও তার ভিত্তিটা ছিল নড়বড়ে। জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে ঘটেছিল বিভাজন। এক্ষেত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি একক জাতীয়তাবাদে দেশবাসীকে একাট্টা করার লক্ষ্যে নিজস্ব দূরদর্শিতা প্রয়োগ করেছিলেন। আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীনতা, একাত্তরের বিজয়। বৈশ্বিক পটভূমিকায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান নিয়ে লিখেছেন মফিদুল হক। এই বিশেষ প্রবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা–১০

জাতির উদ্দেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষণ

৩০শে ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচন উপলক্ষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কেএম নূরুল হুদার জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ দেখুন, পৃষ্ঠা–১৫

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

স্বাধীনতার প্রথম প্রহরের শহিদ এটিএম জাফর আলম সিএসপি

মোহাম্মদ শফিউল আলম

এটিএম জাফর আলম আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহিদের অন্যতম। তাঁর পুরো নাম আবু তাহের মোহাম্মদ জাফর আলম। ১৯৪৭ সালের ৫ই মে পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার হলদিয়া পালং ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের রুমখাঁপালং গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ হোসাইন মাস্টার। তিনি শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। আট ভাই এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়ো। তিনি ১৯৬৪ সালে মহেশখালী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ডিস্টিংশনসহ আর্টস গ্রুপে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এইচএসসি, ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে অনার্স এবং ১৯৭০ সালে মাস্টার্স পরীক্ষায় যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করেন।

শহিদ এটিএম জাফর আলম স্মরণে কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফ আরাকান সড়কে নির্মিত স্মৃতিসৌধ

রাজনীতি সচেতন এটিএম জাফর আলম চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যয়নকালে ছাত্রলীগের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম কলেজ শাখার দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে সাবেক ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক) শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও হল ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের দীক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়ে ১১ দফা আন্দোলন ও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে সম্মুখভাগে নেতৃত্ব দেন। '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পক্ষে নিরলসভাবে নিজ এলাকায় ব্যাপকভাবে ভ্রমণ ও জনযোগাযোগে সম্পৃক্ত হন। ৬ দফা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকালে তিনি পাক সরকারের পেটুয়াবাহিনী কর্তৃক ধৃত হয়ে চরম নির্যাতনের শিকার হন এবং তাতে তাঁর মেরুদণ্ডে গুরুতর আঘাতজনিত ফ্র্যাকচার হয়। দীর্ঘদিন অর্ধ শরীরে প্লাস্টার নিয়ে তিনি কালযাপন করেন এবং এই ফ্র্যাকচার নিরাময়ে নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করেন।

এটিএম জাফর আলম অনার্স পাসের পর তৎকালীন কায়েদে আজম কলেজে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী কলেজ) খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা পেশাকে বেছে নেন। শিক্ষাজীবন শেষে এটিএম জাফর আলম ১৯৭০ সালের সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস (সিএসএস) পরীক্ষায় সিএসপি ক্যাডারে কৃতকার্য হন। এখানেই সিভিল সার্ভিসের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্বাধীনতার পর প্রণীত শহিদদের তালিকায় তাঁর নামের শেষে 'সিএসপি' শব্দটি সংযুক্ত হয়ে আছে।

সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে বাংলার জনগণ আওয়ামী লীগের পক্ষে যে ঐতিহাসিক গণরায় প্রদান করেন সেই গণরায়কে অস্বীকার করার হীন মানসিকতায় ১লা মার্চ পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান এক বেতার ঘোষণার মাধ্যমে ৩রা মার্চ ঢাকায় আহুত জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হয়। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সেই আন্দোলনকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপদান করতে থাকে। শহিদ জাফর আলম ১৯৭০ সালে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় বঙ্গবন্ধু ইকবাল হলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতাদের সাথে অঘোষিত সভায় মিলিত হন বলে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তার বই *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছর*-এ উল্লেখ করেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে পাক হানাদারবাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল)। এই ইকবাল হলই ছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদর দপ্তর। সে কারণেই পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর বিশেষ নজর ছিল এই হলের দিকে।

বঙ্গবন্ধু ১৯শে মার্চ জাফর আলমকে জরুরিভাবে ডেকে পাঠালে তিনি ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে হাজির হন। তখন বঙ্গবন্ধু তাঁকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তাবাহী পত্র দিয়ে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় ও সমমনা নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরণ করেন। ঐ বার্তাদি পৌঁছিয়ে দিয়ে তিনি ২৫শে মার্চ রাত আনুমানিক ১০ টার দিকে হলে ফিরে আসেন। শ্রমসাধ্য ও কঠিন যোগাযোগ ব্যবস্থার সেই দীর্ঘ সফরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর গায়ে ছিল ১০৩/১০৪ ডিগ্রি জ্বর। সেই জ্বর নিয়েই শুয়ে পড়েছিলেন বলে তাঁর বন্ধু মো. হোসেন সেরনিয়াবাতের কাছ থেকে জানা যায়।

জাফর আলমের লেখনি ছিল ক্ষুরধার, বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও তিনি অনেক সাহিত্যধর্মী লেখালেখি করতেন। ১৯৬৬-৬৭ বর্ষে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত ইকবাল হল বার্ষিকীতে এ নিদর্শন মিলে। তাঁর হাতের লেখা ছিল চমৎকার, ভাষা ছিল নির্ভুল। এজন্য হলের বা

বিশ্ববিদ্যালয়ের যত পোস্টারিং, দেয়াল লিখন অধিকাংশই ছিল তাঁর হাতে লেখা। মাঝেমধ্যে বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ পত্রাদি লেখা বা দলিলাদির মুসাবিদা প্রণয়ন বা ডিকটেশন নেওয়ার কাজে জাফরকে ব্যবহার করতেন বলে তাঁর বন্ধু/সতীর্থদের কাছ থেকে জানা যায়। [সূত্রঃ ব্যারিস্টার জি আর মাহমুদ, যুক্তরাষ্ট্র]

২৫শে মার্চ ১৯৭১ কালরাতে পাকবাহিনীর আক্রমণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা

পাকিস্তানি বাহিনীর ২৫শে মার্চ রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিচালনার অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিল ইকবাল হল। এ সময় প্রায় সব ছাত্রনেতা ও কর্মী মধ্যরাতে হল ত্যাগ করতে থাকেন। কিন্তু স্বাধীনতার দৃপ্ত মন্ত্রে উজ্জীবিত জাফর আলম থেকে গেলেন ইকবাল হলে। সেই কালরাতে নীলক্ষেত রোড থেকে মর্টার, রকেট লাঞ্চার, রিকোয়েললেস রাইফেল এবং ভারী মেশিনগান ও ট্যাংক থেকে অবিরত গোলার আক্রমণ পরিচালিত হয়। তিনি তাঁর সহযোগী বন্ধুদের নিয়ে রাইফেল দিয়ে হানাদারবাহিনীর আক্রমণের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে হলের কর্মচারীদের কাছ থেকে জানা যায়। এক সময় তাদের বারুদ শেষ হয়ে যায়। পাকবাহিনী হলের দিকে মার্চ করতে করতে হল ঘিরে ফেলে। প্রতিটি রুমে, ছাদে, পানির ট্যাংকে সর্বত্র ব্যাপক তল্লাশি চালায়। শহিদ জাফর আলমের ৩০৩ নং রুমে রাইফেলসহ তাঁকে পাওয়ায় তাঁর ওপর নির্মম বেয়নেট চার্জ করে হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ করে ফেলে। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের একটি বইতে ইকবাল হলের ছাত্রদের পক্ষ থেকে সেদিন প্রতিরোধের একটি প্রাণপণ চেষ্টা হয়েছিল মর্মে সমর্থন পাওয়া যায়।

তাঁর সাথে শহিদ হন তৎকালীন ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা চিশতি শাহ হেলালুর রহমান, সালেহ আহমদ মজুমদার, জাহাঙ্গীর মনির, আবুল কালাম, মো. আশরাফ আলী খান, আবু তাহের পাঠান, শামসুদ্দিন ও আব্দুল জলিল নামে দুইজন কর্মচারীসহ নাম না জানা আরো অনেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কে এম মুনির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭১-৭২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে ইকবাল হলে প্রায় ২০০ জন শহিদ হন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের স্মৃতিফলকে এটিএম জাফর আলমসহ ৭ জনের নাম উৎকীর্ণ রয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে জাফর আলম ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোশহীন। ন্যায়নিষ্ঠাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দিক। প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজেকে মানিয়ে নিয়ে তাকে জয় করার দৃঢ় মনোবল তাঁর ছিল। স্বাধীনচেতা জাফর আলম দেশের স্বাধীনতার দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন, বঞ্চনা ও লুণ্ঠন দেখে দেখে। বঙ্গবন্ধু আপামর জনসাধারণকে যখন এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার লক্ষ্যে একটু একটু করে এগিয়ে নিচ্ছিলেন, তখন সচেতন ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে স্বাধীনচেতা জাফর আলম ঘরে বসে থাকেননি। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর ডাকে। নিজেকে যুক্ত করেছিলেন সেই মিছিলে। ইকবাল হলে ছাত্রসমাজের একজন হয়ে ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করার কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। কাল হলো সেখানেই। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় ইকবাল হল, যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

তখনকার ছাত্রনেতা মাসুদ পারভেজ (নায়ক সোহেল রানা) শহিদ মুক্তিযোদ্ধা এটিএম জাফর আলম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সারির শহিদ বলে বিভিন্ন টিভি সাক্ষাৎকার (চ্যানেল আই, সময় টিভি) এবং লেখায় (ভোরের কাগজ) উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, মাসুদ পারভেজ ছিলেন এটিএম জাফর আলমের বন্ধু। 'চোখের সামনে ভেসে ওঠে জাফরের নির্মম দৃশ্য' শিরোনামে এক লেখায় মাসুদ পারভেজ ইকবাল হলের দারোয়ানের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, জাফরকে তিনতলা থেকে নিষ্ঠুরভাবে টেনেহিঁচড়ে নামাতে নামাতে মেরেছে। নিচতলায় এসে জাফরের মাথা ফেটে যায় এবং তাঁর মাথার মগজ বেরিয়ে সিঁড়ির সাথে লেগে থাকে। মাসুদ পারভেজ বলেন, দেশ শত্রুমুক্ত হলে যখন আমি ইকবাল হলে যাই, দেখলাম সেই মগজ শুকিয়ে গেছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্মমতা, বর্বরতা, অত্যাচার-নিপীড়ন, শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধাচরণ করায় এই দেশের ছাত্র-শিক্ষক, কুলি-মজুর, কৃষক-শ্রমিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের জনসাধারণকে ২৫শে মার্চ কালরাতে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল বাঙালির স্বাধীনতার দীর্ঘদিনের লালিত আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু নিপীড়িত বাঙালি রক্তের বলে সেদিন পরাভব মানেনি। জাফর আলমসহ লাখো বাঙালির রক্ত বৃথা যায়নি। ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন দেশে উড়ল বিজয়ের লাল-সবুজ পতাকা।

এটিএম জাফর আলমের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য ইকবাল হলের স্মৃতিফলকসহ রুমখাঁপালং সরকারি প্রাথমিক বিদালয়ের শহিদ এটিএম জাফর আলম মিলনায়তন, রেজুখালের ওপর নির্মিত শহিদ জাফর আলম সেতু এবং কক্সবাজার লিংক রোড থেকে টেকনাফ পর্যন্ত আরাকান সড়কের নাম পরিবর্তন করে শহিদ এটিএম জাফর আলম আরাকান সড়ক হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজারের রামুস্থ খুনিয়াপালং-এ শহিদ এটিএম জাফর আলম মাল্টি ডিসিপ্লিন অ্যাকাডেমি (SAJAMA), উখিয়ার ক্লাস পাড়ায় শহিদ এটিএম জাফর আলম স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উখিয়া উপজেলার কোট বাজারে শহিদ এটিএম জাফর আলম বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও লাইব্রেরি এবং তাঁর নিজ বাড়িতে শহিদ এটিএম জাফর আলম ডায়াবেটিক ও কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো শহিদ জাফর আলমের স্বপ্ন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছে।

সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে প্রবহমান ধারায় প্রবাহিত করতে পারলেই জাফর আলমরা বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল।

লেখক: মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নিবন্ধ

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও আমাদের বিজয়

শামসুজ্জামান খান

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এক নবদিগন্ত উন্মোচনকারী ঘটনা। আমাদের এই উপমহাদেশ দীর্ঘদিন ছিল পরাধীন। ফলে এই অঞ্চলে সামাজিক জাগরণ এবং শিক্ষাদীক্ষার তেমন প্রসার ঘটেনি। পূর্ব বাংলার অবস্থা ছিল আরো করুণ। কারণ ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজধানী কলকাতার পশ্চাদ্‌ভূমি হিসেবে এই অঞ্চল ছিল আরো পশ্চাৎপদ। তবে এ অবস্থার মধ্যেও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে নানা অঞ্চলে যেসব কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে তাতে জাগৃতির উপাদান সঞ্চিত হচ্ছিল। কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার বাঙালির জাতিসত্তা গঠন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আকস্মিক ছেদ পড়লেও ১৯৪০-এর দশক থেকেই তা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকারের সংগ্রাম এবং সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা ধীরে ধীরে গভীরতা অর্জন করে। এই ধারাটি ১৯৬০-এর দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এবং অর্থনৈতিক মুক্তির কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামের সর্বোচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হয়। এরই ধারাবাহিক পরিণতি উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার নবজাগ্রত বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়। এই ঘটনাকে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে নবদিগন্ত উন্মোচনকারী বলে আখ্যাত করেছি। মাত্র কয়েকটি লাইনে আমরা দীর্ঘ সময়কালের ইতিহাসের একটি অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরেছি। এর প্রতি স্তরে অসংখ্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাপ্রবাহ এবং তার অভিঘাতে সৃষ্ট নানা পরিস্থিতির মোকাবিলা করে বাঙালি শেষ পর্যন্ত তাদের অশেষ সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রটি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বাঙালির দুই-আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসের মধ্যে অটুট ঐক্যবদ্ধ হয়ে এমন ঘটনা সৃষ্টির আর নজির নেই। এক্ষেত্রে এই অঞ্চলের নির্যাতিত-নিপীড়িত দুঃখী মানুষের জীবনপণ সংগ্রাম এবং বঙ্গবন্ধুর ক্যারিশমেটিক নেতৃত্বেরও আর কোনো তুলনা আমাদের ইতিহাসে নেই।

আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ মাত্র নয় মাসে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই নয় মাসকে সৃষ্টি করেছে আরো কত দিন, কত মাস তার খুঁটিনাটি তথ্য এখনো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ থেকে শুরু হলেও এর পটভূমিগত একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারলে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের এই পটভূমিকার সূচনাবিন্দু কখন– ইতিহাসকারদের মধ্যে কেউ কেউ তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ১৭৫৭ সাল থেকেই এই সময়কাল নির্ধারণ করতে চান। কেউ কেউ মনে করেন– না, অত পেছনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ১৯০৫ সাল থেকে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছিল, সেখান থেকেই বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়েছে বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকই ১৯৪৮-৫২ সালে ভাষা আন্দোলন থেকেই আমাদের মুক্তিসংগ্রামের শুরু বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, এর আগে আর কখনো বাঙালি জাতিসত্তা এতটা তৃণমূলস্পর্শী এবং সর্বব্যাপক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমরা এই মতের গুরুত্ব উপলব্ধি করেও আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসকে আর একটু পেছনে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। আমাদের মতে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সূচনা পর্ব হিসেবে ১৯২০-এর দশককে নির্ধারণ করাই যথাযথ। আমাদের এই মতের পক্ষে যুক্তি হলো, ১৯২০-এর দশক বাংলার ইতিহাসে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশের জন্য এই দশক অনন্য। কারণ এর আগে ১৯০৫ সালে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত তাতে নেতৃত্ব ও আধিপত্য সবটাই ছিল উচ্চশিক্ষিত নগরবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের। বাঙালি মুসলমান এই আন্দোলনে তেমন অংশগ্রহণ করেনি। ফলে ইংরেজ আমলে সৃষ্ট বাংলার অসম বিকাশের (uneven development) কারণে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান একই জাতীয় চেতনা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। নগর সমাজের ওপরের স্তরে শুধু হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির মধ্যেই বাঙালি জাতীয়তার চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪) পর বাঙালির বিশেষ করে পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে মূল্যবোধগত একটি পরিবর্তন দেখা

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১, ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ে সাধারণ মানুষ

দেয়। নগদ অর্থের অভাবে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে পূর্ব বাংলার কৃষিজীবী মুসলমানদের মধ্য থেকে আর্থিকভাবে সচ্ছল কিছু মানুষ নানাভাবে যুদ্ধজনিত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এরফলে ধীরে ধীরে গ্রামীণ বাংলাদেশের কৃষক সমাজের মধ্য থেকে নতুন একটি শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে উঠতে থাকে। ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই তৈরি হতে থাকে আগামীদিনের নব আলোকবার্তাবাহীরা। এরাই ধীরে ধীরে গ্রামে এবং শহরে-বন্দরে তাদের অবস্থান সৃষ্টি করে নিতেও সক্ষম হয়। এমনকি স্থানীয় সরকার নির্বাচনসহ রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মেও তাদের আনাগোনা শুরু হয়। এরফলে বাংলার রাজনীতিতেও একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম নবাব নাইটদের জায়গায় কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা আইনজীবী বা অন্য পেশার মুসলমানেরাই রাজনীতিতে বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন। চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক চুক্তি মুসলিম মধ্যবিত্তকে বিকাশের একটা পরিসর দেয়। এর ব্যাপকভাবে প্রভাব বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও পড়তে শুরু করে। পরে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বও নিজ হাতে রাখেন। এতে দ্রুত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একটি আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশের দশক থেকে ত্রিশের দশকের এই ঘটনা বাংলার রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে।

এছাড়াও ১৯২০-এর দশকে সাহিত্য ক্ষেত্রে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব এক যুগ পরিবর্তনকারী ঘটনা। এই প্রথম বাঙালি মুসলমান ব্যাপকভাবে বাঙালি জাতিসত্তা গঠনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর আগে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম উপাদান খুব নগণ্যমাত্রায় ছিল বলে বাঙালি মুসলমান এতে কোনো আগ্রহ বোধ করেনি। কিন্তু নজরুল বাংলা সাহিত্যে বিপুল মুসলিম উপাদান এবং সেই সাথে সাথে হিন্দু ও বিশ্বপুরাণ এবং ঐতিহ্যের নিপুণ প্রয়োগ ঘটানোয় ব্যাপক বাঙালি মুসলমান বাঙালিত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এতে হিন্দু ও মুসলিম বাঙালির মধ্যে যে অসম অর্থনৈতিক বিকাশজনিত পার্থক্য ও বৈষম্য ছিল তা কিছু পরিমাণে হ্রাস পায় এবং নজরুল হয়ে ওঠেন বাঙালির জাতীয় কবি। নজরুলের আবির্ভাবের এই চেতনা বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে গভীরতর মাত্রা যোগ করেছে। অতএব নজরুলের ঐতিহাসিক আবির্ভাবকালের এই সামাজিক জাগরণ, অপূর্ণ বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পূর্ণতা দানের প্রয়াস এবং অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনমূলক সাহিত্যকে বাদ দিলে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এমনকি আন্তর্জাতিক মানবিক চৈতন্যে ভাস্বর বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসও কঠিন হয়ে পড়তো। নজরুল বলেছিলেন, বাংলা বাঙালির হোক, বাংলার জয় হোক। নজরুলের ভাঙার গান-এ (১৯২২), 'পূর্ণ অভিনন্দন' শীর্ষক কবিতায় 'জয় বাংলা' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে। এই 'জয় বাংলা'ই ছিল মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির এক বিরাট শক্তিশালী অস্ত্র। এইসব ঘটনাকে বাদ দিলে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে বোঝা কি সম্ভব? এছাড়া ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এই পার্টির প্রগতিশীল ভূমিকাও যে নতুন বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজে নব চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেনি এই কথাও তো বলা যাবে না।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯২৬ সালে ঢাকায় যে মুসলিম সাহিত্যসমাজ গড়ে ওঠে বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক ও যুক্তিবাদী রাষ্ট্র গঠনে তার ভূমিকাও গুরুত্ব বহন করে। অতএব ১৯২০-এর দশক বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যে অসাধারণ পটভূমিকায় ভূমিকা পালন করেছে তা বাদ দিলে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস রচনা অসম্পূর্ণ থাকবে।

এবার আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার বিষয় নির্বাচন এবং সমস্যা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস রচনা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি চ্যালেঞ্জও বটে। প্রথম কথা হলো, বাংলার ঐতিহাসিকেরা এতটা বিশাল এবং সম্পূর্ণ নতুন ঘটনাসম্পন্ন ইতিহাস রচনা এর আগে করেননি। এই ইতিহাস রচনার পদ্ধতি কী হবে সে ব্যাপারেও কোনো প্রখ্যাত পণ্ডিত এখন পর্যন্ত কোনো গ্রহণযোগ্য দিক-নির্দেশনা দেননি। অতএব এই ইতিহাস রচনায় কী প্যারাডাইম ব্যবহৃত হবে সে প্রশ্নও আছে। প্রচলিত প্যারাইডাইমশিফট তো হতেই হবে। কিন্তু সেটা কোন ধরনের? এই ইতিহাস যথাযথভাবে তৃণমূল পর্যায় থেকে লিখতে হলে এবং এর অনন্য স্রষ্টা কৃষক-সন্তান ও ব্রাত্যজনের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিতে হলে ফিল্ডওয়ার্ক পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। ইতিহাসের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গবেষকেরা এ ধরনের কাজও আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত করেননি। সাধারণ মানুষের বীরত্ব, সাহসিকতা এবং জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করার অনন্য শৌর্যকে তুলে ধরতে হলে মাঠ পর্যায়ে বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান অতি জরুরি। সেই কাজ ঐতিহাসিকেরা যে করবেন সে রকম প্রশিক্ষণওতো আমাদের ইতিহাসে নেই।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ইতিহাস রচনার জন্য নানা বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছেন। কেউ বলছেন, মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস লেখাই যথাযথ হবে। অনেকেই এই পদ্ধতিকে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন না। তারা বলেন, এভাবে ইতিহাস লিখলে তাতে শুধু সামরিকবাহিনীর গুরুত্বই প্রাধান্য পাবে। তারা বলছেন, মুক্তিযুদ্ধকালীন ২১টি জেলাকে ধরেই তৃণমূল পর্যায়ে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং তার প্রামাণিকরণের ভিত্তিতেই ইতিহাস লেখা সমীচীন। এতে ঐতিহাসিকদের ইতিহাস রচনায়ও একটি নতুন চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক ইতিহাস তো হতেই হবে। তাছাড়াও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা এবং বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে আটক থাকা সত্ত্বেও তিনি যে বাস্তবের প্রমাণসাইজের মানুষের চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছিলেন এবং হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার এক অসাধারণ প্রতীক তাকেও যথাযথ মাত্রায় ধারণ করতে হবে। যুদ্ধ হয়েছে বহু স্তরে এবং বহু স্থানে। যুদ্ধ কোথাও সরাসরি, কোথাও পরোক্ষ, কোথাও গেরিলা পদ্ধতিতে। এসব বিষয়গুলোকেও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যে আনতে হবে। এই যুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা, ভারত সরকারের ভূমিকা, শরণার্থী সমস্যা, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা, বাংলাদেশে অবরুদ্ধ মানুষ, পাকিস্তানে আটকে পড়া সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিদের ও প্রবাসী বাঙালিদের বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পুলিশ, ইপিআর, সেনা, নৌ-কমান্ডো এবং নারীদের অবদানও চিহ্নিত করতে হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যে জনযুদ্ধ ছিল এ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। গ্রামবাংলার কৃষক-ক্ষেতমজুর এবং ব্রাত্যজনের ভূমিকাই ছিল প্রধান। এদের অসংখ্য বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনাকেও তুলে ধরতে হবে। আমরা আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধকে ব্রাত্যজনের এবং সাধারণ মানুষের যুদ্ধ বলে আখ্যাত করি। কিন্তু এই যুদ্ধে সেনাবাহিনীর বাইরের কোনো সাধারণ মানুষ বা ব্রাত্যজন কেন বীরশ্রেষ্ঠ হতে পারলেন না? ঐতিহাসিকদের কাছে মানুষ সে প্রশ্নেরও জবাব প্রত্যাশা করে। বিজয়ের অর্ধশত বছর হতে চলেছে। এখন ১৬ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সঠিক ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। অতএব মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করতে হবে বহুমুখী দৃষ্টিকোণে এবং বহুমাত্রিক অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে।

লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

প্রবন্ধ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান

সেলিনা হোসেন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নারীর জীবন অধ্যয়নের একটি বড়ো দিক। এই যুদ্ধে নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারী তার সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করেছিল স্বাধীনতার মতো একটি বড়ো অর্জনে। পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ ছিল তার জীবনবাজি রাখার ঘটনা। অথচ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারীকে মূলধারায় স্থাপন না করার ফলে নারীর প্রকৃত ইতিহাস যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে নারী যে গৌরবগাথা রচনা করেছিল তা ধর্ষিত এবং নির্যাতিত নারীর ভূমিকায় অদৃশ্য হয়ে আছে। প্রকৃত অবদান খুঁজে নারীকে মূলধারায় না আনার আরো একটি কারণ, নিম্নবর্গের নারীরাই ব্যাপকভাবে এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। নিম্নবর্গ নারীর ইতিহাস ক্ষমতাশীল সুশীল সমাজের কাছে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গৃহীত হতে শুরু করে স্বাধীনতার তিন দশক পরে।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রশিক্ষণরত নারী মুক্তিযোদ্ধা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে গবেষণা পর্যায়ে খানিকটুকু কাজ হয়েছে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষিতজন এবং নিরক্ষর অধিকাংশ মানুষের প্রচলিত ধারণায় মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেনি। নারীযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে গুটিকয় নারী। যুদ্ধের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে নারীদের ধর্ষণের ঘটনা প্রচার লাভ করেছে অনেক বেশি। যে কারণে নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষিতজনরা অবলীলায় বলে যান, ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা...। ধর্ষণ, নারী নিপীড়নের ঘটনা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা। যুদ্ধের সময়ে নারী-ধর্ষণ শত্রুপক্ষের যুদ্ধ কৌশল। এর দ্বারা লড়াকু প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে, নৈতিকভাবে দুর্বল করে ফেলার চেষ্টা করা হয়। এখানে ইজ্জতের প্রশ্ন ওঠে না। যুদ্ধে নারীর মর্যাদা সমানভাবে যোদ্ধার ধর্ষিত নারী বলে তাকে অভিহিত করলে আজীবনের জন্য একটি চিহ্ন তাকে বয়ে বেড়াতে হয়। ধর্ষণকে একটি দুর্ঘটনা হিসেবে গণ্য করলে সেটি একটি সাময়িক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। নারীর মর্যাদাহানিতে লেজুড়ের মতো আটকে থাকে না। এভাবে ভাষা ব্যবহারে পুরুষের আধিপত্য নারীকে বন্দি করে রাখে। কয়েকজনের কথা বললে বোঝা যাবে নারীরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কত বড়ো সহায়কশক্তি ছিল। সাধারণ মানুষ জানতে পারবেন যুদ্ধ নারীকে কত আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল। বীরপ্রতীক খেতাব পাওয়ার মতো যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা সমাজ এবং রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাননি। অদৃশ্য হয়ে গেছে এসব নারী। এগিয়ে আছে পুরুষরা। কারণ ক্ষমতা, রাজনীতি এবং পুরুষতন্ত্রের সুবাদে পুরুষরা সুযোগ গ্রহণের মুখ্য ভূমিকায় থাকে।

নারী যোদ্ধা করুণার কথা। বর্তমানে করুণা বেগম থাকেন ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে দোয়ারিকা-শিকারপুর ফেরিঘাটের মাঝে অবস্থিত রাকুদিয়া গ্রামে। যুদ্ধ শুরু হলে তার স্বামী শহীদুল হাসান যুদ্ধে যোগদান করেন। একদিন রাজাকারদের হাতে ধরা পড়েন শহীদুল। তারা তাকে গুলি করে হত্যা করে। করুণা তিন বছরের শিশুকে মায়ের কাছে রেখে স্বামীর মৃত্যুর এক মাস পরে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। বরিশালের মুলাদী থানার কুতুববাহিনীতে তিনি আরো অনেকের সঙ্গে অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই বাহিনীর ৫০ জন নারীযোদ্ধার তিনি কমান্ডার ছিলেন। তিনি গ্রেনেড, স্টেনগান এবং রাইফেল চালানো শেখার পাশাপাশি বিস্ফোরকদ্রব্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে, পাগলিনী সেজে শত্রুশিবিরে অপারেশন চালিয়েছেন। তার এ অসম সাহসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের দায়িত্ব পান। পাকিস্তানি বাহিনীর শক্ত ঘাঁটি ছিল মাহিলাপাড়ায়। ৫ জন নারী এবং ১০ জন পুরুষের একটি দল করুণা বেগমের নেতৃত্বে এই ঘাঁটি আক্রমণ করেন। তিনি নিজেই পর পর পাঁচটি গ্রেনেড ছুড়ে আক্রমণের সূচনা করেন। চার ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যান তারা। ১০ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। তাদের দলের একজন আহত হন। পাকবাহিনীর এলোপাতাড়ি গুলি করুণা বেগমের ডান পায়ে বিদ্ধ হয়। বর্তমানে তিনি ক্র্যাচে ভর দিয়ে চলাফেরা করেন। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা এই নারী এখন কেমন আছেন? ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি দুটি রাষ্ট্রীয় ভাতা পেয়েছিলেন। একটি স্বামী শহিদ হওয়ার কারণে, অন্যটি নিজে যুদ্ধাহত বলে। ছেলে ১৮ বছর হওয়া পর্যন্ত ভাতা পেয়েছিলেন। এখন তিনি আর কোনো ভাতা পান না। এখন তাঁর পেট চালানো দায়। কোন রাজাকার তার স্বামীকে হত্যা করেছিল, একথা বলার সাহস তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

মিরাসি বেগম আরেকজন মুক্তিযোদ্ধা। তার পৈতৃক বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা থানার পায়েরতল গ্রামে। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর চার ছেলেমেয়ে নিয়ে মদন থানায় রান্নার কাজ করে সংসার চালাতেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকবাহিনী মদন থানার দিকে আসছে খবর পেয়ে থানার পুলিশরা ১২টা রাইফেল মিরাসি বেগমের কাছে রেখে চলে যায়। মিরাসি রাইফেলগুলো নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের কাছে যান এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তিনি স্টেনগান চালানো ও গ্রেনেড ছোড়ার প্রশিক্ষণ নেন। তিনি অল্প সময়ে আগ্নেয়াস্ত্র চালানোয় দক্ষ হয়ে ওঠেন। সেইসঙ্গে ছিল তাঁর অকুতোভয় মনোভাব। মিরাসি ক্যাম্পে একদিকে রান্নার কাজ করতেন, অন্যদিকে ছদ্মবেশে অস্ত্র-গোলাবারুদ আনা-নেওয়া করতেন। তিনি মদন, কান্দাহার, বাজিতপুর ও কাপাসিয়ার সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। একাত্তরের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে যুদ্ধে যুক্ত রেখেছিলেন। দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছিলেন। স্বাধীনতার পরে কমান্ডারের সঙ্গে নিজে গিয়ে অস্ত্র জমা দেন। এখন তিনি কেমন আছেন? মো. আবু সাঈদ লিখেছেন– 'দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে নারী দেশের মুক্তির জন্য নিজের ভিটেমাটি পর্যন্ত শেষ করেছিলেন, তিনি আজ সর্বহারা। দিনে দিনে তার স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছে। নুয়ে পড়েছে শরীরের প্রতিটি পেশি। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জরাগ্রস্ত এই যোদ্ধাকে এখন লোকে বলে অর্ধপাগল। অর্থাভাবে চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তিনি। ঘরহারা এই যোদ্ধা মাঝে মাঝে থাকেন মদন থানায় তার ভাইপোর কাছে। আবার চলে যান বিভিন্ন মাজারে। এখন মাজার, গাছতলা আর ক্ষুধা একাত্তরের এই বীর মুক্তিযোদ্ধার নিত্যসঙ্গী'।

মুক্তিযোদ্ধা কাঞ্চনমালার বাড়ি লৌহজং থানার কমলা ইউনিয়নের ডহরি গ্রামে। মুক্তিযুদ্ধের দুই বছর আগে তাঁর বিয়ে হয় নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর থানার বিরিশিরি গ্রামে। এই গ্রামেই তিনি ধরা পড়েন পাকিস্তানি বাহিনীর মেজর জাহিদের হাতে। মেজর তাঁকে একটি ঘরে আটকে রেখে পাশবিক নির্যাতন চালায়। একদিন ঘর খোলা পেয়ে দৌড়ে পালাতে গেলে সিপাহিরা তাঁর পিছু তাড়া করে। সোমেশ্বরী নদীর ধারে ওরা তাঁকে ধরে ফেলে। প্রচণ্ড প্রহারে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

মরে গেছে ভেবে তারা তাঁকে ফেলে রেখে চলে যায়। জ্ঞান ফিরলে দেখতে পান বাড়ইকান্দি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে শুয়ে আছেন তিনি। একজন মুক্তিযোদ্ধা ওই নদীর ধার দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে দেখতে পেয়ে ক্যাম্পে নিয়ে আসেন এবং চিকিৎসার জন্য ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সুস্থ হয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ভারতের তুরা ক্যাম্পে এবং স্থানীয়ভাবে টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে। যুদ্ধের বাকি সময় তিনি টাঙ্গাইল ও ঘাটাইলে অবস্থান করেন।

মির্জাপুরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করেন। নার্স হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তুরার হাসপাতালে। ফলে আহত যোদ্ধাদের শুশ্রূষায়ও তিনি ছিলেন একজন অপরিহার্য ব্যক্তি। তিনি এমন একজন নারীর উদাহরণ যিনি ধর্ষণের শিকার, সশস্ত্র যোদ্ধা এবং সেবিকা। এই নারীও রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো স্বীকৃতি পাননি, বরং অদৃশ্য হয়ে গেছে তাঁর বীরত্ব, সাহস আর শুশ্রূষার মতো মমতার কাজ। স্বাধীনতার পরে উপেক্ষিত হয়েছেন পরিবারের মূলত স্বামীর কাছে, সমর্থন পেয়েছেন শ্বশুরবাড়ির অন্যদের কাছে। তারপরও টেকেনি বিয়ে। তিনি বলেছেন, 'আমিতো স্বেচ্ছায় পাকবাহিনীর কাছে যাইনি। আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। তখন কেন এ সমাজ উদ্ধার করল না? তখন কোথায় ছিল এ সমাজ, কোথায় ছিল আমার স্বামী? যখন যুদ্ধ শেষ করে দেশ স্বাধীন করলাম, তখন আমি নষ্ট হলাম না। দেশ স্বাধীনের পরে যখন মুক্তিযুদ্ধে আমার প্রয়োজন শেষ, এখন নষ্ট হয়ে গেলাম! নারী হয়ে জন্মেছি বলে সব দোষ আমার'। এ পর্যন্তই আপাতত শেষ করা যায়। আরো এমন অসংখ্য নারী আছেন যারা অসংখ্য প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেছেন সমাজকে, রাষ্ট্রকে।

এ গেল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের যুদ্ধের দিক। আর কী করেছে নারীরা? প্রবাসী সরকার নূরজাহান মুরশিদকে ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দান করে। তাঁর দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য ভারতের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার অভিযান পরিচালনা করা। তিনি ভারতের পার্লামেন্টের যুক্ত অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য স্মরণীয় বক্তৃতা করেন। তাঁর এই অপরাধের জন্য পাকিস্তানের সামরিক সরকার তাঁকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার দণ্ডাদেশ জারি করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন বদরুন্নেসা আহমেদ। তাঁকে 'মুজিবনগর মহিলা পুনর্বাসন কার্যকলাপ ও মহিলা সংগঠন'-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নির্দেশে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতেন। তার দায়িত্বের মধ্যে ছিল শরণার্থী শিবির পরিদর্শন শেষে রিপোর্ট প্রদান, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও নারী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। মুজিবনগর সরকার ভারত সরকারের সহযোগিতায় কলকাতার পদ্মপুকুর এলাকার গোবরাতে নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করে। এ ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী। এ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণের মধ্যে ছিল ফার্স্ট এইড ও নার্সিং প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র চালনা শিক্ষা।

স্বাধীনতাকামী জনগণের মনোবল দৃঢ় রাখার উদ্দেশ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে নারীরা। খবর পাঠ করে, কথিকা পড়ে, গান গেয়ে বেতারে অনবরত প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছে তারা। শিল্পীরা গঠন করেছেন 'মুক্তিযুদ্ধ শিল্পী সংস্থা'। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংগীত পরিবেশন করে তারা সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। এছাড়া সরাসরি রণাঙ্গনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, গেরিলা যুদ্ধে শত্রুর অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রেকির ভূমিকা, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে রন্ধনশালায়, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করে, হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের শুশ্রূষায়, গ্রামে-শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান করে, শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়ে আবার অস্ত্র হাতে লড়াই করে, বিভিন্ন দূতাবাসে প্রবাসী সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে, সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে জনযুদ্ধের সাফল্যকে নিশ্চিত করেছিল নারীরা। তাদের ব্যতিক্রমী অবদান হিসেবে দুজন নারীকে 'বীরপ্রতীক' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছিল।

বীরত্বগাথার এমন অবদান সত্ত্বেও সাংগঠনিক প্রতিনিধিত্বের অভাবে অসংখ্য নারী মুক্তিযোদ্ধা আড়ালে পড়ে থাকেন। তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া তো দূরের কথা তাঁদের পরিচিতি সংরক্ষণ করার কাজটিও উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে ব্যাপৃত অনুসন্ধানীদের কাছে প্রতিনিয়ত মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমরা কি ভুলতে পারি কসবার কুল্লাপাথরের ৫১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার সমাধিস্থল গড়ে ওঠার ইতিহাস! মুক্তিযোদ্ধা আবদুল করিমের মা মহীয়সী নারী আরজাতুন নেসা তাঁর স্বামী আবদুল মান্নানের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস এই এলাকায় এবং এলাকার আশপাশে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের লাশ বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সেসব লাশ গোসল করিয়ে বীরের মর্যাদায় দাফন করার দায়িত্ব পালন করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল এবং লাশ ধোয়ানোর চৌকিটি যার স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে। আরজাতুন নেসা ১৯৭৩ সালেই মৃত্যুবরণ করেন। স্বাধীনতার পর শহিদদের স্বজনরা লাশের খোঁজে আসতেন। কবরের ওপরে পড়ে আহাজারিতে ভরিয়ে তুলতেন তাদের বাড়ির চারপাশ। আরজাতুন নেসা সেসব নারীকে বুকে জড়িয়ে টেনে তুলতেন। গোসল করিয়ে ভাত খেতে দিতেন। তাঁর ছেলে আবদুল করিম বলেন, 'তাদের কান্নায় মায়ের বুকও ভেঙে যেত। সেই শোকে-দুঃখে মা আমার বেশিদিন বাঁচেননি'। পুরো দেশেই নারী মুক্তিযোদ্ধাদের এরকম বীরত্বগাথা রয়েছে, যা এখনো মুক্তিযুদ্ধের নির্মম অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র-এর একটি খণ্ডে রাজারবাগ পুলিশ লাইনসের ডোম রাবেয়া খাতুন নারীদের ওপর নির্মম অত্যাচারের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার দায় নারীরা বহন করেছে স্বাধীনতার জন্য। তাদের অনেকে স্বাধীনতার পরে জন্ম দিয়েছে যুদ্ধশিশু। বেশিরভাগ নারী স্বাধীনতার পরে সমাজের পুরুষতন্ত্রের নির্মম আচরণে ভালোবাসা পায়নি, স্বামী-সন্তান পায়নি। অবজ্ঞায়, অবহেলায় পাগল হয়ে পথে পথে দিন কাটিয়েছে অনেকে। আর যারা ধর্ষণের শিকার হয়েও পরিবারে ঠাঁই পেয়েছে তাদের ঠেলে রাখা হয়েছে অন্ধকার কুঠুরিতে, রাখা হয়েছে খুব সাবধানে, আড়াল করে। দিনের আলোয় বের হতে দিয়ে কেউ বলেনি, এসো এই নারীর বীরত্বগাথার জন্য তাকে সংবর্ধনা দিই। পরবর্তী প্রজন্মকে বলি– এদের দেখ। এদের মূল্য তোমরা শোধ করতে পারবে না। তাই মুক্তিযুদ্ধে নারীর ইতিহাস নারী– অধ্যয়নে প্রতিফলিত হতে হবে।

আমি আমার 'যুদ্ধ উপন্যাসটি' শেষ করেছি এভাবে: যুদ্ধে একটি পা হারিয়ে প্রেমিক ফেলে এসেছে স্বাধীন দেশে। প্রেমিকা তখন পাকিস্তান সেনা কর্তৃক ধর্ষিত হওয়ার ফলে গর্ভবতী। দুজনের যখন দেখা হয় তখন প্রেমিকা প্রেমিককে বলে, 'ভালো কইরে দেখো হামাক। তুমহি দেছো পা। হামি দিছি জরায়ু। তুহমার পায়ের ঘা শুকায়ে গেছে। কয়দিন পর হামারও জরায়ুর ঘা শুকায়ে যাবে। হামি ভালো হয়ে যাব'।

নারীর জীবন এবং নারীর অধ্যয়নকে এভাবে মেলাতে হবে। নারীর জীবনে যে চিত্র প্রতিফলিত হয় তার পরস্পর সংযুক্তি সাহিত্যে ঘটবে। বাস্তবতার নির্মমতার ভিতর দিয়ে এগোবে সাহিত্য। আমাদের শিক্ষার্থী, গবেষক, শিক্ষকরা যদি অনবরত নারী জীবনের অনুপুঙ্খ বিবরণ এবং গভীর মাত্রা সামনে না নিয়ে আসেন তাহলে নারী-অধ্যয়নের বিষয়টি উপরি-অধ্যয়ন হবে, গভীরতম অন্তরালোকটি অদৃশ্য হয়েই থাকবে। যে কারণে সমালোচনা শুনতে হয় যে, নারী বিষয়ক লেখাগুলো বিদেশি অর্থে প্রভাবান্বিত বাইরের মানুষের দৃষ্টি দিয়ে দেখা। যেখানে বাংলাদেশের নারীর জীবন অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখা যায়, সে দেখায় আলো নেই। নারীর জীবন খুঁজে দেখার প্রকৃত চেষ্টা অনুপস্থিত।

লেখক: কথাসাহিত্যিক

প্রবন্ধ

বৈশ্বিক পটভূমিকায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ

মফিদুল হক

বিশ শতকের সূচনা থেকে বাঙালির জাতীয় চেতনার উত্থানের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তৃতীয় বিশ্বের পদানত জাতিসমূহের ভাগ্য। এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ইংরেজ, ফরাসি, হিসপানি, দিনেমার, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় শক্তির কলোনি। এরপর সম্পন্ন হয়েছিল স্ক্র্যাম্বল ফর আফ্রিকা বা কৃষ্ণ মহাদেশ ভাগাভাগি করে নেওয়া, যেখানে বিলম্বিত প্রবেশ ঘটেছিল জার্মান বা বেলজীয় রাজ্যের। উপনিবেশ নিয়ে দ্বন্দ্ব জন্ম দিয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের, যার ফলে পালটে গিয়েছিল ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র। সাম্রাজ্য ভেঙে গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্রের উত্থান প্রত্যক্ষ করা গেল এই সময়ে। পাশাপাশি রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জারতন্ত্র তথা রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সাম্যের সমাজ তথা শ্রমিক-কৃষকের রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখায় মানবসমাজকে। পদানত জাতির মুক্তির বাণী প্রচার করে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশ্বের বহু দেশের বিপ্লবীদের একত্র সমাবেশ জন্ম দিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের। মানবমুক্তির আহ্বান ঔপনিবেশিক দেশসমূহে সঞ্চার করেছিল চাঞ্চল্য। তখন এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি, অথচ বাস্তবে আরেক ধ্বন্দ্বমূলক ঘটনারও জন্ম হয়েছিল সোভিয়েত সাম্রাজ্যের উত্থানে। ইউরোপে রাজতন্ত্রের অবসানে একাধিক জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটলেও জারের পতনের পর রুশ সাম্রাজ্যে কোনো ফাটল বা বিভাজন ঘটল না, পূর্বতন জার সাম্রাজ্যই নবগঠিত বিশাল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

ইউরোপে জাতিরাষ্ট্রের উত্থান জাতীয়তাবাদী চেতনায় নবশক্তি জোগালেও তা উগ্র জাতীয়তাবাদে পর্যবসিত হতে সময় নেয়নি। অচিরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় মানবসমাজ, জার্মান জাতিসত্তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি মানুষকে কেবল নিষ্ঠুর হন্তারকে পরিণত করেনি, জাতিগত সংহারমূলক কর্মকাণ্ডকে প্রায় এক ইন্ডাস্ট্রির রূপ দিয়েছিল, যার ফলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের গ্যাস চেম্বারে লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে, কেবল ইহুদি হওয়ার কারণে, বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করতে কারো চোখের পাতায় বিন্দুমাত্র কম্পন সৃষ্টি হয়নি। প্রায় একই ধরনের কর্মকাণ্ড এশিয়াতে ঘটেছিল জাপানি জাত্যাভিমানের কার্যকারণ যোগে, যা নানজিং গণহত্যা এবং কোরীয় নারীদের নিগ্রহের কারণ হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাত্যাভিমানে মত্ত শক্তির পরাজয় ঘটেছিল সোভিয়েত-মার্কিন আঁতাতভুক্ত মিত্রশক্তির কাছে, মনে হয়েছিল জন্ম নেবে এক নতুন পৃথিবী গণতন্ত্র ও মানব মুক্তির ব্রত নিয়ে। ইউরোপের মানচিত্রে আবারো ঘটল পরিবর্তন, অতীত অসংগতি মোচন করে জন্ম নিল আরো কতক নতুন রাষ্ট্র, গড়ে উঠল সমাজতান্ত্রিক শিবির। অন্যদিকে উপনিবেশিক সাম্রাজ্যে চিড় ধরেছিল মহাযুদ্ধের ফলে, পদানত জাতির মুক্তির প্রশ্ন পরিণত হয় বাস্তব এজেন্ডায়, একে একে স্বাধীন হতে থাকে একদা-ঔপনিবেশ রাষ্ট্রসমূহ, যার মধ্যে সামনের কাতারে ছিল ভারত উপমহাদেশ। ১৯৪৭ সালে আপোশরফার মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হলো বটে, তবে তা ঘটল বিভাজনের পথ বেয়ে। দ্বিজাতিতত্ত্বের হিন্দু-মুসলিম বিভেদের আদর্শ অবলম্বন করে মুসলিমদের হোমল্যান্ড বা আবাস হিসেবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ নিয়ে 'পাকিস্তান' নামে এক অভিনব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো, যে রাষ্ট্র গঠনের জন্য পাঞ্জাব ও বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমের দুই অংশের মধ্যে হাজার মাইলের ব্যবধান হলেও তাদের মধ্যে মিল বলতে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম পরিচয় 'ইসলাম'। পাকিস্তান ভাষা ও সংস্কৃতি বিচারে বহুজাতিক রাষ্ট্র হলেও সেটার স্বীকৃতি সেখানে ছিল না, ধর্ম পরিচয়কে জাতি পরিচয় হিসেবে বরণ করে তা রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং ধর্মসত্তা দ্বারা জাতিসত্তা আবৃত করার জন্য শুরু হয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ-আয়োজন।

ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নানা পরিচয় ধারণ করে থাকে এবং কোনো একক পরিচয় অন্য সত্তাসমূহ অস্বীকার করে না। জাতি পরিচয় গড়ে ওঠে ভাষা, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি-ইতিহাস, ভূগোল, জীবনধারা ইত্যাদি বহু উপাদানের মিলন-মিশ্রণ ও ধারাবাহিকতায়। বাংলাদেশের অভ্যুদয় এই পরম্পরা ও ধারাবাহিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন। কিন্তু জাতি পরিচয়ের নামনিশানা মুছে দিয়ে কল্পিত এক ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র, যে প্রয়াসের বিপরীতে অসাম্প্রদায়িক উদার গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ অবলম্বন করে বিকশিত হতে চেয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এর তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে। এই ভিত্তি নির্মাণে বহুমুখী অবদান রেখেছিল সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মধারা ও আন্দোলন, যা পল্লবিত হয়েছিল নানাভাবে। সর্বোপরি বাঙালিত্বের চেতনায় পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের একত্র করে অনন্যসাধারণ জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যা তৃতীয় বিশ্বের পদানত জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলনে এক ব্যতিক্রমী অধ্যায় রচনা করেছিল, যদিও বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে বৃহত্তর পটভূমিকায় বিচারের প্রয়াস আমরা খুব কমই দেখতে পাই।

বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বামপন্থি বুদ্ধিজীবী মহলে জাতীয়তাবাদ নানাভাবে সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদে দেশবাসীকে একাট্টা করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শিতা, একাগ্রতা ও বিশাল অর্জনের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক বিশ্লেষণ খুব বেশি দেখা যায় না। পাশ্চাত্য চিন্তার অনুগামী হয়ে মার্কসবাদী সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন বুদ্ধিজীবীদের বড়ো অংশ জাতীয়তাবাদকে পশ্চাৎপদ চিন্তার প্রতিফলন হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁদের কারো কারো কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত জাতীয়তাবাদের সমালোচনা পরমভাবে বরণীয় হয়েছে এবং তাঁরা বিস্মৃত হন এর বিশেষ পটভূমি। অনেকের কাছেই বেনেডিক্ট এনডারসনের 'কল্পিত জনগোষ্ঠী' হিসেবে জাতীয়তাবাদকে চিহ্নিতকরণ তাত্ত্বিক বিচারে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের পদানত জাতির মুক্তি আন্দোলনের নিরিখে জাতীয়তাবাদ বা আত্মপরিচয়ের গুরুত্ব এভাবেই হয়েছে উপেক্ষিত। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক উপলব্ধির দুই উদাহরণ মেলে ধরে সেই নিরিখে আমরা বিচার করতে চাইব বাঙালির জাতিচেতনা ও জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভবের গুরুত্ব। অন্য সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও জ্ঞানের মধ্যে যে সম্পর্ক কার্যকর থাকে সেদিকটাতে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এডওয়ার্ড সাঈদ। তাঁর বিবেচনায় ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিরূপে জড়িয়ে আছে উপনিবেশবাদ এবং সেই চিন্তা দ্বারা আরোপিত এক ধরনের রুদ্ধবাক অবস্থা, যেখানে প্রাচ্যের কোনো কণ্ঠ শ্রুত হয় না, প্রাচ্য ব্যাখ্যাত হয় পাশ্চাত্য দ্বারা। ওরিয়েন্টালিজমের প্রবক্তা এডওয়ার্ড সাঈদ প্রাচ্যের জাতীয়তাবাদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর

'ন্যাশনালিজম, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ইমপেরিয়ালিজম' প্রবন্ধে। তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদের ভিন্নতর স্বীকৃতি দিয়ে তিনি লিখেছিলেন যে, তাদের কেউ কেউ জাতীয়তাবাদের সমালোচক হলেও আরেকভাবে ছিলেন জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ টেনে সাঈদ লিখেছেন–

> তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসবিদদের দিক থেকে যা মনোযোগ পায়নি সেটা হলো জাতীয়তাবাদের যারা সমর্থক তাদের দ্বারাও অনেক সময় বৈপরীত্যমূলকভাবে জাতীয়-বিরোধী চিন্তা প্রকাশ করা হয়েছে, যদিও তারা মনেপ্রাণে ছিলেন জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। বিশ শতকের সূচনায় ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরোধী, জাতীয় কবি ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর এক উদাহরণ। তাঁর ১৯১৭ সালের বিভিন্ন ভাষণে তিনি জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেছেন এর রাষ্ট্র-আনুগত্য, শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা ও সামরিক শক্তির কারণে, একইসাথে তিনি ছিলেন প্রবলভাবে জাতীয়তাবাদী।

প্রাচ্য বিষয়ে প্রচলিত চিন্তাধারা তাই আরো তলিয়ে দেখার রয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয় বিষয়ে পাশ্চাত্যের যে ন্যারোটিভ সেখানে পাকিস্তানের ভেঙে পড়ার কাহিনিই প্রাধান্য পেয়েছে। একটি ধর্মতান্ত্রিক একনায়কত্ববাদী সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র, যা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করেছিল, তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের গণসংগ্রাম ছিল ভিন্নতর নব্য-ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে একটি জাতির মুক্তিসংগ্রাম। তদুপরি এটা ছিল ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের সাম্প্রদায়িক চিন্তাকাঠামো ভেঙে অসাম্প্রদায়িক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তর্ভুক্তি বিপুল তাৎপর্য বহন করে। এক্ষেত্রে মুস্তাফা কামাল পাশার তুরস্কের পর বাংলাদেশ ছিল দ্বিতীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, যা রাষ্ট্রের আদর্শের সঙ্গে ধর্মের যোগ ছিন্ন করে সম্প্রীতির সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছিল। প্রতিক্রিয়ার শক্তির উত্থানের ফলে বাংলাদেশ স্বীয় প্রতিষ্ঠাকালীন আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি, যা তুরস্কের ক্ষেত্রেও বাস্তব সত্য, কিন্তু সার্বজনীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে নানাভাবে এবং বাঙালির সমন্বিত সংস্কৃতি এই সংগ্রামে আমাদের পাথেয় ও প্রেরণা হয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিচ্ছিন্নতাবাদ হিসেবে চিহ্নিত করে এর দমনে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হয় পাকিস্তান, সমর্থনও তারা পায় পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াই যে দুর্বার হয়ে ওঠে তার বড়ো ভিত্তি ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তথা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অংশী হিসেবে এর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সফলতা। পাকিস্তান কার্যত হয়ে উঠেছিল এক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, সেটা বাঙালির প্রতিরোধ সংগ্রামে তীক্ষ্ণভাবে মেলে ধরেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তান এক রাষ্ট্র হিসেবে তৎকালে বিশ্বজনীন স্বীকৃতি পেলেও কার্যত তা ছিল বিচ্ছিন্ন দুই অংশের সম্পর্কসূত্রে প্রায় দুই রাষ্ট্রের চরিত্রসম্পন্ন, যার কেন্দ্র ছিল পশ্চিমে এবং পূর্বাংশের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পশ্চিমের। তৃতীয় বিশ্বের পদানত দেশসমূহের স্বাধীনতা লাভ করার ন্যায্যতা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছিল ষাটের দশকের গোড়ায়, যখন এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ একে একে অর্জন করছিল স্বাধীনতা এবং জাতিসংঘ গ্রহণ করেছিল পদানত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংবলিত ঘোষণা। বাংলাদেশ আন্দোলন ধাপে ধাপে 'রাইট অব দ্য নেশনস্ ফর সেলফ ডিটারমিনেশন'-এর পর্যায়ে উন্নীত হয় এর গণতান্ত্রিক ভিত্তি ও শাসনতান্ত্রিক পন্থার কারণে। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিফলন ঘটেছিল বঙ্গবন্ধুর সূচিত ৬ দফা আন্দোলনে, যা জাতীয় ম্যান্ডেট লাভ করে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এবং দুর্বার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় '৭১-এর মার্চে। বাঙালি জাতির নিজ ভাগ্য নিজে নির্মাণ তথা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চিরতরে নস্যাৎ করতে পাকবাহিনী নিষ্ঠুর গণহত্যা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু জনগণের নির্বাচিত নেতা হিসেবে ঘোষণা করেন স্বাধীনতা, জনপ্রতিনিধিরা মুক্ত মেহেরপুরের আম্রকাননে একত্র হয়ে জারি করেন স্বাধীনতার ঘোষণা। ফলে বাঙালির জাতিরাষ্ট্রের সংগ্রাম তৃতীয় বিশ্বের মুক্তি আন্দোলন থেকে আলাদা ছিল না, বিচ্ছিন্নতাবাদ হিসেবে একে চিহ্নিত বা নিন্দিত করার উপায় বিশেষ থাকে না।

বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম যে তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রবাহভুক্ত ছিল এই উপলব্ধির পরিচয় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই দিয়েছিলেন অস্ট্রেলীয় অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির প্রধান হারবার্ট ফেইথ। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্লিন্ডার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এশিয়ান স্টাডিজ' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন:

> বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সাফল্য বস্তুত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী রাষ্ট্রীয় সীমানা পালটাবার সফল বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রয়াস হিসেবে গণ্য হবে। তবে এই উদাহরণের প্রতিক্রিয়া খুব ব্যাপক হবে না এজন্য যে, বাংলাদেশ আন্দোলন হচ্ছে অনন্য, যা এমন এক অঞ্চলের কণ্ঠ হয়ে উঠেছে যেটা মেট্রোপলিটন মূল ভূমি থেকে বহু দূরে অবস্থিত। এটা তৃতীয় বিশ্বের সম্ভাব্য অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রয়াস থেকে পৃথকভাবে অনেক বেশি উপনিবেশবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সমতুল্য। সর্বার্থেই এটা উপনিবেশবাদ-বিরোধী আন্দোলন, এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রমী দিক হচ্ছে যে, এটা কোনো ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়। সচরাচর আমরা উপনিবেশবাদ-বিরোধিতাকে দেখি শ্বেতাঙ্গদের শোষণ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে তামাটেদের উত্থান হিসেবে। কিন্তু কোরীয় জাতীয়তাবাদ– যা ছিল জাপানিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত, ছিল উপনিবেশবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ। তাহলে বাংলাদেশ সংগ্রামকে কেন আমরা এই কাঠামোতে বিবেচনা করবো না?

বিশ শতকের মুক্তি আন্দোলনের নিরিখে বৃহত্তর পরিসরে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই বিবেচনা করার রয়েছে অশেষ গুরুত্ব। বাঙালির জাতীয়তাবাদ অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমন্বয়বাদী সম্প্রীতির যে আদর্শ বহন করে তা ধর্ম বিভাজন অতিক্রম করে জাতিসত্তায় মিলনের পথ প্রশস্ত করে। জাতীয়তাবাদের ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী চরিত্র ধারণ করে এই সম্প্রীতির আদর্শে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র, আজকের ধর্মভিত্তিক সংঘাতময় বিশ্বে তার গুরুত্ব অপরিসীম। এডওয়ার্ড সাঈদ যখন Third World Nationalism বা তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদ হিসেবে পৃথক প্রপঞ্চ দাঁড় করাতে চান তখন আমরা বুঝে নিতে পারি তিনি পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স থেকে আলাদা এক সত্তা-পরিচয় শনাক্ত করতে চাইছেন। সেই নিরিখে বাঙালি জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব অনুধাবনে সচেষ্টতা দেখাতে হবে আমাদের। ২০২১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী সামনে রেখে বহুতর গবেষণা সম্পন্ন হবে, নতুন আলোকে আমরা চিনে নিতে পারব আপন সত্তা ও এর তাৎপর্য, সেই আশাবাদ এখানে ব্যক্ত করা যায়।

লেখক: ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে প্রথম বিজয় বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ-১৯৭২

খালেক বিন জয়েনউদদীন

উনিশশ একাত্তর থেকে দুই হাজার আঠারো– বর্ষ পরিক্রমায় আটচল্লিশ বছর। অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ২০১৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ৪৭ বছর পূর্ণ হবে। '৭১ বাঙালির পরম প্রাপ্তির বছর, স্বাধীনতার বছর। আর সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং যুদ্ধ শেষে আমাদের বিজয় অর্জিত হয়েছিল ১৬ই ডিসেম্বর। ১৬ই ডিসেম্বর তাই শত্রুকবলমুক্ত হবার দিন, পাকিদের হারানোর দিন এবং নতুন সূর্যোদয়ের দিন।

প্রথম বিজয় বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ-১৯৭২

সাতচল্লিশ বছর, প্রায় অর্ধ শতাব্দী। হিসাব করলে কম বছর নয়। তারুণ্য পেরিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠের কাছাকাছি। আমাদের সকল আন্দোলন ও যুদ্ধের ফসল বাংলাদেশ। বিজয়ের অর্জিত স্বাধীনতা আমাদের কী দিয়েছে? এখন আর এমন প্রশ্ন কেউ করে না। এখন কেউ বলে না বাংলাদেশ 'তলাবিহীন ঝুড়ি'। বরং আমরা গৌরব করে বলতে পারি আমরা খু-উ-ব ভালো আছি। '৭১-এর বিজয়, '৭১-এর স্বাধীনতা আমাদের সমৃদ্ধির মহাসড়কে ঠাঁই দিয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রে এখন বাংলাদেশের যোগ্য অবস্থান। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে, '৭৫ থেকে '৯৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের ছিল দুঃসময় ও নিষিদ্ধকাল। এ সময় আমরা অনেকটা স্বপ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। কিন্তু কেউ আমাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। বার বার আঘাত এসেছে আমাদের চিন্তা-চেতনা ও অর্জনগুলোর ওপর। স্বাধীনতার সাড়ে ৩ বছরের মাথায় আঘাত হানা হয় বাংলাদেশের স্থপতির ওপর। তাঁকে নির্বংশ করা হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে। হত্যা করা হয় তাঁর আত্মীয়স্বজনদের। জেলের মধ্যে খুন করা হয় তাঁর সহচর এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল সংগঠকদের। মোহাম্মদপুর ও বিটিভিতে মেরে ফেলা হয় স্বাধীনতার স্বপক্ষের লোকদের। এই হত্যাকাণ্ডের পরে চলে সংবিধান পরিবর্তনের মহা উৎসব। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশ করে পাকিদের ছায়ায় দেশ চালায় অবৈধ সরকার। '৯৬ সাল পর্যন্ত অন্ধকারে জীবনযাপন করেছেন স্বাধীনতা স্বপক্ষের মানুষরা। কত নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করেছে–তার ইয়ত্তা নেই।

ছিয়ানব্বই সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশ ফিরে দাঁড়ায়। এ সময়ের পাঁচটি বছর বাদ দিলে বিগত বছরগুলোয় বাংলাদেশের অর্জন বিশ্বনন্দিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ ভোট ও ভাতের অধিকার ফিরে পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফাঁসি হয়েছে। '৭১-এর খুনিদের ফাঁসি হয়েছে এবং হচ্ছে। এছাড়াও বিডিআরের হত্যাকাণ্ড ও শেখ হাসিনাকে বিনাশ করার অভিপ্রায়ে গ্রেনেড হামলার বিচারও শেষ পর্যায়ে। আবার মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রেরণ, নিজ অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দান দেশে ও বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। এই অর্জনগুলোর মধ্যে পার্বত্য এলাকার সমস্যা নিরসন, সমুদ্র বিজয় ও ছিটমহল সংকট সমাধানের কথাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের বিজয় শুধু শত্রুকে পরাজিত করার মধ্য দিয়েই হয়নি, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। আর এর মূলে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সফলের সারথি শেখ হাসিনা।

এই সুসময়েও আমাদের মনে পড়ে '৭১-এর লড়াইয়ের কথা। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর দেশটি পাকিরা দখল করে আছে। তাদের সাথে আছে এদেশীয় রাজাকার, বদর ও শামসবাহিনীর অস্ত্রধারীরা। বঙ্গবন্ধু তখন পাকি কারাগারে। আমরা যুদ্ধ করছি মাঠে-খানা-খন্দরে। সেই যুদ্ধেও পৃথিবী দুই ভাগ হয়ে গেছে। পাকিদের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আরেক পরাশক্তি চীন। আমাদের পক্ষে শুধু ভারত-রাশিয়া ও পৃথিবীর স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তির মানুষেরা। ৯ মাসের যুদ্ধ হলেও এর প্রস্তুতি ছিল সংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমে। যার প্রস্তুতিপর্ব বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর নির্বাচন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের প্রথমে অসহযোগ আন্দোলন এবং পরে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতার লড়াই। একাত্তরের সেই বিজয় একদিনে আসেনি। এ বিজয়ের জন্য বঙ্গবন্ধু সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন মুক্তিকামী মানুষদের নিয়ে। অবশেষে সেই চূড়ান্ত বিজয় '৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর। বিনিময়ে আমাদের দিতে হলো ৩০ লক্ষ বাঙালির তাজা প্রাণ এবং ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম। আমরা পেলাম শত্রুমুক্ত একটি স্বাধীন স্বদেশ। যদিও ছিল বিধ্বস্ত, তবুও লাল- সবুজে খচিত মায়ের আঁচলে ঘেরা সোনার বাংলাদেশ।

একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর কেমন ছিল? তখন দেশের প্রতিটি এলাকায় চলছিল শত্রু হননের পালা। দেশের নিরীহ মানুষ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশ বাণী, বিবিসি'র মাধ্যমে শুনত যুদ্ধের খবর। আমরা ছিলাম যুদ্ধের ময়দানে। আমাদের পেছনে ছিল তাজউদ্দীন আহমদের মুজিবনগর সরকার ও মুক্তিযুদ্ধের মিত্রমাতা ইন্দিরা গান্ধীর ভারত ও ভারতের বিপুল জনগোষ্ঠী। একাত্তরের পয়লা ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা পাকি সৈন্যদের পতন শুরু হয়। ৩রা ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকার ভারত সরকারের সাথে উভয় দেশের সেনাদের দিয়ে যুক্ত কমান্ড গঠন করে। ৫ই

ডিসেম্বর ভুটান ও ৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। অন্যদিকে পাকিস্তান ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ করে যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়। আর বাংলাদেশেও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিত্রসৈন্য ৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে কাবু করে ফেলে পাকি সৈন্যদের। পাকিদের ঢাকা অরক্ষিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা পাকি সৈন্যমুক্ত হতে শুরু করে। এ সময় জাতিসংঘে আমাদের যুদ্ধ নিয়ে দেনদরবার চলে। রাশিয়ার কারণে তা ভেস্তে যায়। অবশেষে পাকিস্তানি সৈন্যের ঢাকায় যুক্ত কমান্ডের অধিনায়ক জেনারেল অরোরার কাছে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে পাকিস্তানের পরাজয় ঘটে, বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয় এবং বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। পাকি জেনারেল নিয়াজী ছিলেন সুচিন্তিত সেনা কর্মকর্তা। আত্মসমর্পণ করে তিনি পাকি সৈন্যদের বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

যুদ্ধরত বীর মুক্তিযোদ্ধা

আমাদের বিজয়ের ২৫ দিন পর বঙ্গবন্ধু পাকি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। অচিরেই নির্বাচন দেন, সংবিধান তৈরি করেন এবং অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি আদায় করেন। মিত্রসৈন্য দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন আর শুরু করেন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড। ভাবতে অবাক লাগে– এরই সাথে তাঁর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ *বাংলাদেশ* প্রকাশ করে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়। ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রথম বিজয় দিবস উপলক্ষে এটি প্রকাশিত হয় আর্ট পেপারে। সাদা-কালো হলেও মুদ্রণ পরিপাট্য অপূর্ব। আর এর লেখক ও সম্পাদকবৃন্দ ছিলেন আমাদের দেশের নামজাদা ব্যক্তিবর্গ। ডাবল ক্রাউন আকারের ১৩২ পৃষ্ঠার *বাংলাদেশ* শিরোনামের এই বইটি ছেপেছিল দেশের প্রথম উন্নতমানের প্রেস পদ্মা প্রিন্টার্স।

দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটির লেখকবৃন্দ ছিলেন: সৈয়দ আলী আহসান, ড. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, দুর্গা প্রসাদ ধর, সরদার ফজলুল করিম, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, মোহাম্মদ জমীর, কেজি মোস্তফা। মূলত এই গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের সংগ্রাম, স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট, অভ্যুদয় এবং তৎকালীন সরকারের ইতিহাস ও পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। বইটির সূচিপত্র ও পরিশিষ্ট এরকম–

সূচীপত্র

মুখবন্ধ: সৈয়দ আলী আহসান

জাতীয় সঙ্গীত

বঙ্গবন্ধু: একটি প্রতীক

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি: ডক্টর সালাহ্উদ্দীন আহমদ

স্বাধীনতা আন্দালনের ইতিহাস: আবদুল গাফফার চৌধুরী

বাংলাদেশের উদ্ভব: দুর্গা প্রসাদ ধর

জাতীয়তাবাদের ভূমিকা: সরদার ফজলুল করিম

বাঙালী সংস্কৃতি: বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

স্বাধীনতা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা: ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বাঙালী বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিজীবী দলন: নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী

পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন: মোহাম্মদ জমীর

বাংলাদেশে গণহত্যা–বিদেশীদের চোখে: সংকলন ও সম্পাদনা: খন্দকার গোলাম মুস্তফা

পরিশিষ্ট

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

বাংলাদেশের মৌলিক পরিচয়

বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা

গ্রন্থপঞ্জী: সংকলন ও সম্পাদনা: মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন

লেখক ও শিল্পী পরিচিতি

সম্পাদনা সংসদ:

সভাপতি: সৈয়দ আলী আহসান

সদস্য: খোন্দকার গোলাম মুস্তফা

সদস্য: আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

সদস্য: বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

সদস্য: অধ্যাপক নূরুল ইসলাম

সদস্য: মোহাম্মদ জমীর

সদস্য সচিব: নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা উপসংঘ:

সভাপতি: কামরুল হাসান

সদস্য: কাইয়ুম চৌধুরী

সদস্য: রফিকুন্নবী

সদস্য: কালাম মাহমুদ

সদস্য সচিব: মহিউদ্দিন আহমদ

গ্রন্থটির শুরুতেই 'বঙ্গবন্ধু একটি প্রতীক' শিরোনামে একটি রচনা ছিল–

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান– এক অপরূপ মোহিনী শক্তি এই নামে। প্রতিটি বাঙ্গালীর মনের মুকুরে ভেসে উঠে রূপকথার এক বীর নায়কের প্রতিচ্ছবি। ভেসে উঠে বাংলার প্রতিটি নির্যাতিত মানুষের প্রতি দরদ ও ভালোবাসাসিক্ত একটি মানুষের চেহারা। যে অসাধারণ ধৈর্য, সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে তিনি তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামে অসংখ্য অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানী শাসক ও শোষক চক্রকে রুখে দাঁড়ান তার তুলনা কেবলমাত্র রূপকথা ও পৌরাণিক মহাকাব্যের অতিমানবিক নায়কদের মধ্যেই পাওয়া

যায়। প্রায় এক যুগব্যাপী কারাজীবনে তিনি অন্ততপক্ষে দু'বার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ান। কিন্তু কখনো মুহূর্তের জন্যে এতটুকু দমেন নি, টলেন নি। সব রকমের দুঃখকষ্ট এবং বিপদের মধ্যেও তাঁর চেহারায় দেখা যেতো বিজয়ীর হাসি। যে অপূর্ব স্থৈর্য ও নির্লিপ্ততার মধ্য দিয়ে তিনি তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মোকাবেলা করেন তা কেউ কোনদিন ভুলবে না। পাকিস্তানী শাসক চক্র তাঁর জনগণের প্রতি কিছুটা সংযত আচরণ করবে, শুধুমাত্র একথা বিবেচনা করেই ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে তিনি কিভাবে গ্রেফতার বরণ করেন তা সমগ্র বিশ্ব জানে। কিন্তু কার্যত তা

মিত্রবাহিনীর কাছে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর

হয় নি। প্রতিটি ব্যাপারেই দেখা গেছে যে শেষ পর্যন্ত তিনি বিজয়ীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এসব সাফল্যের পিছনে রয়েছে তাঁর অদম্য সাহস, ইস্পাত-কঠোর সংকল্প, আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং তাঁর জনগণের ঐক্য ও সংহতিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।

বাংলার মানুষ তাঁকে 'আমার নেতা, তোমার নেতা– শেখ মুজিব' 'মুজিব ভাই' এবং সর্বোপরি 'বঙ্গবন্ধু' প্রভৃতি যে নামেই আখ্যায়িত করুক, তিনি প্রতিটি বাঙ্গালী হৃদয়ের মণিকোঠায় সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। তিনি রূপকথার জীবন্ত নায়ক, বাঙ্গালী সত্তার মূর্ত প্রতীক এবং বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভাবাবেগের উৎস।

একথা সত্য যে, বিগত পঁচিশ বছরের বিপ্লবী অগ্নি-পুরুষ বর্তমানে সরকারী ক্ষমতার পুরোভাগে রয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে তিনি কেবল প্রধানমন্ত্রীই নন। তিনি তাঁর জনগণের সর্বপ্রকার ধ্যান-ধারণা, আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। কারণ একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির সামগ্রিক প্রতিরোধ শক্তি তিনিই গড়ে তোলেন। কর্মজীবনে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও গতিশীল নেতৃত্বে সবচাইতে বড়ো অবদান হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এটাই তাঁর কর্মজীবনের মূল কথা। এটাই তাঁকে ও তাঁর জনগণকে গৌরবের বিজয়মাল্যে ভূষিত করেছে।

আর সম্পাদকীয়তে সৈয়দ আলী আহসান লেখেন:

> পৃথিবীর ইতিহাসে দেখেছি যে, ধর্মকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অতীতে বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। করা হয়েছে শুধু মাত্র বিশেষ গোত্রের শাসন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য। পাকিস্তানী আমলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ধর্মকে তাঁদের শোষণের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিলেন। মানুষে মানুষে মানুষ হিসেবে যে ঐক্যবন্ধন, যে ঐক্যবন্ধন ক্ষুধা-তৃষ্ণা-আকাঙ্ক্ষার সমতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে সে ঐক্যবন্ধনকে পাকিস্তানী শাসকরা ভয় করতেন। তাই তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন নেতিবাচক ব্যবধানের উপর, যার ফলে একটি বিরোধকে চিরস্থায়ী মূল্য দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দুই বিরোধী আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য শাসনযন্ত্র নির্মাণ করা হয়েছিল। বাঙ্গালীদের পক্ষে আবেগ ভুলে গিয়ে, অনুভূতিকে হারিয়ে এবং আপন অস্তিত্বের শেষ লিপি মুছে দিয়ে শুধু একটি অবধারিত ধর্মীয় নিয়মে পাকিস্তানে সচল থাকা সম্ভবপর হয়নি। তারা প্রতিবাদ করেছে, ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, কখনও প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেছে, কিন্তু আপন দাবী কখনও পরিত্যাগ করেনি।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা বাঙালিরা চিন্তায় ও কর্মজগতে একত্রিত হলাম এবং বাংলাদেশের প্রকৃতি, ঘটনা, ইতিহাস এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বাস করবার অধিকার দাবী করলাম। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী তাদের নিষ্ঠুর শোষণ-নিষ্ঠায়, বিকৃত স্বার্থপরতায় আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল, যার ফলে জীবনের যথাতথ্যকে অস্বীকার করে তারা এক অস্বাভাবিক জীবন নির্মাণ করতে চেয়েছিল, যেখানে জীবনের অঙ্গীকার ছিল না।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তিও গঠিত হয়েছে। আমরা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমাদের স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রকে গড়ে তুলবার সুযোগ পেয়েছি। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের দেশ শত্রু-কবল মুক্ত হলো, আমরা একটি বিশেষ মুহূর্তকে আবিষ্কার করেছি, যে মুহূর্তে আমরা পুরোনো বন্ধনদশা থেকে নতুন সূর্যোদয়ে উপস্থিত হয়েছি, যখন একটি যুগ শেষ হচ্ছে এবং বহুদিন পর্যন্ত রুদ্ধবাক একটি জাতির আত্মা আপন কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছে। আজকের দিনে আমরা দুর্ভাগ্যের সময়সীমা অতিক্রম করে নিজেকে আবিষ্কার করবো। আজকের উৎসব নতুন পদক্ষেপের উৎসব, নতুন সুযোগের উন্মোচনের উৎসব এবং অপেক্ষমাণ ভবিষ্যতের জয়ের উৎসব। [ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭২]

অবশ্য পরবর্তীকালে সৈয়দ আলী আহসান একাত্তরের চিন্তা-চেতনা এবং আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ-এর সংকলিত রচনাগুলো সজীব। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বাংলাদেশের অবস্থান, সংস্কৃতি ও মৌলিক পরিচয় জানার জন্য এটি এখন আকরগ্রন্থ। বইটি পুনঃমুদ্রণ করা গেলে জনগণ দেশের তৎকালীন প্রেক্ষাপট ও চালচিত্র সম্পর্কে জানতে পারবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, *বাংলাদেশ*-এর মতো কলকাতার আনন্দ পাবলিশার্স *বাংলাদেশ নামে দেশ* শিরোনামে অনুরূপ একটি বড়ো আকারে গ্রন্থ প্রকাশ করে দু'মাস পরে। এটির শুরু বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধীর বাণী দিয়ে। এটিও মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য গ্রন্থ। এটি সম্পাদনা করেন অভীক সরকার। পরিকল্পনা ও অঙ্গসজ্জা– প্রখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিক পূর্ণেন্দু পত্রী।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

জাতির উদ্দেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষণ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ৮ই নভেম্বর ২০১৮ জাতির উদ্দেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা ভাষণ দেন।

প্রিয় দেশবাসী,

আমি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করার জন্য আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। একই সাথে নির্বাচনের প্রস্তুতির ওপর কিছুটা আলোকপাত করব। নির্বাচন পরিচালনায় সকল নাগরিকের সহযোগিতার আহ্বান জানাবো।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা ৮ই নভেম্বর ২০১৮ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা উপলক্ষে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন–পিআইডি

শুরুতেই আমি স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। যেসব বীর সন্তান স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়েছেন– তাঁদেরকে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি '৫২-র ভাষা শহিদদের– যাঁদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মায়ের ভাষা, অর্জিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

আন্দোলন, আত্মদান আর সংগ্রামের ফসল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। ভাষা আন্দোলনে আত্মদানের প্রত্যয় নিয়ে স্বাধিকার আন্দোলন। স্বাধিকার আন্দোলনের প্রেরণায় মুক্তিসংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ অর্জন লাল-সবুজ পতাকার একখণ্ড বাংলাদেশ। চরম ক্ষুধা-দারিদ্র্য, অবনতকর আর্থসামাজিক অবস্থান এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত ভৌত অবকাঠামো নিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্ম। নবীন সে দেশটি আজ উন্নত বিশ্ব অভিমুখ অভিযানে দীপ্ত পদে এগিয়ে চলছে। উন্নয়নের আর একটি আরাধ্য সোপান– গণতন্ত্রের মজবুত ভিত্তি। সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্থিতিশীল ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনে উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকে সমান্তরাল পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় নির্বাচন একটি নির্ভরশীল বাহন। ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন, তা এগিয়ে নিয়ে যেতে জনগণের কাছে হাজির হয়েছে। জনগণের হয়ে সব রাজনৈতিক দলকে সে নির্বাচনে অংশ নিয়ে দেশের গণতন্ত্রের ধারা এবং উন্নয়নের গতিকে সচল রাখার আহ্বান জানাই।

প্রিয় দেশবাসী,

আমরা একাদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আইন সংস্কার, ভোটার তালিকা প্রস্তুতসহ ৭টি করণীয় বিষয় স্থির করে ২০১৭ সালে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলাম। সংলাপের মাধ্যমে ৪০টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, পর্যবেক্ষক সংস্থা, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও নারী নেত্রী সংগঠনের কাছে কর্মপরিকল্পনাটি তুলে ধরেছিলাম। তাদের পরামর্শ এবং সুপারিশ বিচার-বিশ্লেষণের পর করণীয় বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যেমন– কতিপয় আইন ও বিধি সংশোধন করা হয়েছে। সংসদীয় এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রায় ৪০ হাজার ভোট কেন্দ্রের বাছাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৭৫টি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা অর্জন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। প্রথমবারের মতো পোলিং এজেন্টগণের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২৮ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখের মধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইতোমধ্যে নির্বাচনের ক্ষণ গণনা শুরু হয়ে গিয়েছে। কমিশনারগণ সংবিধানের আলোকে সংসদ নির্বাচন পরিচালনা করার শপথ নিয়েছেন এবং তাতে তাঁরা নিবিষ্ট রয়েছেন। নির্বাচনি সামগ্রী ক্রয় এবং মুদ্রণের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে পারস্পরিক পরামর্শ আদান-প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচনি দায়িত্বে নিবেদিত রয়েছেন। আমাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেছি।

প্রিয় দেশবাসী,

নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৭ লক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগের প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকায় নির্বাহী এবং বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেওয়া হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনী থেকে ৬ লক্ষাধিক সদস্য মোতায়েন করা হবে। তাদের মধ্যে থাকবে পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, কোস্ট গার্ড, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ। তাদের দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও একাগ্রতার ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হবে। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কারণে নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত হলে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে অসামরিক প্রশাসনকে যথা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সশস্ত্রবাহিনী মোতায়েন থাকবে।

প্রিয় দেশবাসী,

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের জাগরণ ঘটে। তাদের বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা আর উচ্ছ্বাসে গোটা দেশ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। রাজনীতিবিদদের কৌশল প্রণয়ন, প্রার্থীদের নির্ঘুম প্রচারণা, সমর্থকদের জনসংযোগ, ভোটারদের হিসাব-নিকাশ, হাট-বাজারে মিছিল-স্লোগান, পোস্টারে অলি-গলি সয়লাব, চা দোকানে বিতর্কের ঝড়, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, প্রশাসনে রদবদল এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যাপক প্রস্তুতির ঘটনা ঘটে। ভোটের দিনে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে।

২০১৮ সাল সেই নির্বাচনের একটি বছর। নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলো প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে দিয়েছে। সুশীল সমাজ মতামত প্রকাশ অব্যাহত রেখেছে। গণমাধ্যমে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণের মতামত, বক্তব্য, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, আলোচনা-সমালোচনা ও সুপারিশ প্রকাশ করা হচ্ছে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো নির্বাচন নিয়ে প্রতিনিয়ত টক-শো প্রচার করে যাচ্ছে। সব সংবাদমাধ্যম নির্বাচন নিয়ে বিশেষ খবর ও প্রতিবেদন প্রচার করছে। দেশের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দলগতভাবে অংশগ্রহণমূলক এবং সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরামর্শ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংলাপে মিলিত হয়েছেন। সভা-সমাবেশ নির্বাচনি বক্তব্যে উত্তপ্ত হচ্ছে। দেশি-বিদেশি বহুসংখ্যক সংগঠন নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দেশব্যাপী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূল আবহ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

জাতির এমন উচ্ছ্বসিত প্রস্তুতির মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আমি প্রত্যাশা করব, অনুরোধ করব এবং দাবি করব প্রার্থী এবং তার সমর্থক নির্বাচনি আইন ও আচরণবিধি মেনে চলবেন। প্রত্যেক ভোটার অবাধে এবং স্বাধীন বিবেকে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট প্রদান করবেন। স্ব স্ব এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি ভোট কেন্দ্রে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবেন। পোলিং এজেন্টগণ ফলাফলের তালিকা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রে অবস্থান করবেন। নির্বাচনি কর্মকর্তাগণ নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনে অটল থাকবেন। নির্বাহী ও বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটগণ আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ভোট কেন্দ্র, ভোটার, প্রার্থী, নির্বাচনি কর্মকর্তা এবং এজেন্টগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। গণমাধ্যমকর্মী বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করবেন। পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন কমিশনের নীতিমালা মেনে দায়িত্ব পালন করবেন। এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সামগ্রিক পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের আওতায় রাখবে। এভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় জনগণের মালিকানার অধিকার প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়, নতুন সরকার গঠনের ক্ষেত্র তৈরি হয়। এমন নির্বাচনে দেশের সব রাজনৈতিক দলকে অংশগ্রহণ করার জন্য আবারো আহ্বান জানাই। তাদের মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে মতানৈক্য বা মতবিরোধ থেকে থাকলে রাজনৈতিকভাবে তা মীমাংসার অনুরোধ জানাই। প্রত্যেক দলকে একে অপরের প্রতি সহনশীল, সম্মানজনক এবং রাজনীতিসুলভ আচরণ করার অনুরোধ জানাই। সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন প্রত্যাশা করি। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনে প্রার্থীর সমর্থকদের সরব উপস্থিতিতে অনিয়ম প্রতিহত হয় বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন কখনো প্রতিহিংসা বা সহিংসতায় পরিণত না হয়, রাজনৈতিক দলগুলোকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই।

প্রিয় দেশবাসী,

ভোটার, রাজনৈতিক নেতাকর্মী, প্রার্থী, প্রার্থীর সমর্থক এবং এজেন্ট যেন বিনা কারণে হয়রানির শিকার না হন বা মামলা-মোকদ্দমার সম্মুখীন না হন, তার নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর কঠোর নির্দেশ থাকবে। দলমত নির্বিশেষে সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষ ভেদে সকলে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। ভোট শেষে নিজ নিজ বাসস্থানে নিরাপদে অবস্থান করতে পারবেন।

নির্বাচনি প্রচারণায় সকল প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল সমান সুযোগ পাবে। সকলের জন্য অভিন্ন আচরণ ও সমান সুযোগ সৃষ্টির অনুকূলে নির্বাচনে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' নিশ্চিত করা হবে। এসব নিয়ে শীঘ্রই প্রয়োজনীয় পরিপত্র জারি করা হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

নির্বাচনি ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কমিশনের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রার্থীদের তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং নির্বাচনের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি আদান-প্রদান পদ্ধতি সংক্রান্ত সফটওয়্যার, প্রোগ্রাম আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। সরাসরি অথবা অনলাইনেও মনোনয়নপত্র দাখিলের বিধান রাখা হয়েছে। পুরাতন পদ্ধতির পাশাপাশি ভোট গ্রহণে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অনেকগুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে আংশিক ও পূর্ণাঙ্গ ভোট গ্রহণে ইভিএম ব্যবহার সফল হয়েছে। জেলা এবং অঞ্চল পর্যায়ে প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইভিএম-এর উপকারিতা সম্পর্কে ভোটারগণকে অবহিত করা হয়েছে। ইভিএম ব্যবহারে তাদের মধ্যে উৎসাহব্যঞ্জক আগ্রহ দেখা গিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি ইভিএম ব্যবহার করা গেলে নির্বাচনের গুণগতমান উন্নত হবে এবং সময়, অর্থ ও শ্রমের সাশ্রয় হবে। সেকারণে শহরগুলোর সংসদীয় নির্বাচনি এলাকা থেকে দ্বৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় বেছে নেওয়া অল্প কয়েকটিতে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ করা হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

আমি এখন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৩ দফা (৩) উপ-দফা (ক)-এর বরাতে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করছি।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

(ক) মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ: ১৯শে নভেম্বর, ২০১৮ (সোমবার)

(খ) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ: ২২শে নভেম্বর, ২০১৮ (বৃহস্পতিবার)

(গ) প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ: ২৯শে নভেম্বর, ২০১৮ (বৃহস্পতিবার)

(ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ: ২৩শে ডিসেম্বর, ২০১৮ (রবিবার)

[৩০শে ডিসেম্বর ২০১৮ ভোটগ্রহণের দিন নির্ধারণ করে পুনঃতফসিল ঘোষণা করা হয়]

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

তফসিল ঘোষণা ও মনোনয়ন

কে সি বি তপু

দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসেছিল ২০১৪ সালের ২৯শে জানুয়ারি। সংবিধান অনুযায়ী ৩১শে অক্টোবর থেকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষণ গণনা শুরু হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা ৮ই নভেম্বর ২০১৮ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে বিটিভি ও বেতারে ভাষণ দেন। এই ভাষণে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার মাধ্যমে নির্বাচনি কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাঁর ভাষণে নির্বাচন পরিচালনায় সকল নাগরিকের সহযোগিতার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় নির্বাচন একটি নির্ভরশীল বাহন। ... জনগণের হয়ে সব রাজনৈতিক দলকে সে নির্বাচনে অংশ নিয়ে দেশের গণতন্ত্রের ধারা এবং উন্নয়নের গতিকে সচল রাখার আহ্বান জানাই'। তিনি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৩ দফা (৩) উপ-দফা (ক)-এর বরাতে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করেন। সে অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন ৮ই নভেম্বর ২০১৮ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে পরিপত্র-১ জারি করে। পরিপত্রে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ১১-এর দফা (১) অনুসারে নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ, জাতীয় সংসদ গঠন করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকা থেকে একজন সদস্য নির্বাচনের লক্ষ্যে ভোটারগণকে আহ্বান জানিয়ে সময়সূচি ঘোষণা করেছে।

১২ই নভেম্বর ২০১৮ তারিখে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ১১-এর দফা (১) অনুসারে পুনঃনির্ধারণ করে:

(ক)	রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ ২৮ নভেম্বর ২০১৮	বুধবার
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়ন বাছাইয়ের তারিখ	১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ ২ ডিসেম্বর ২০১৮	রবিবার
(গ)	প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ ৯ ডিসেম্বর ২০১৮	রবিবার
(ঘ)	ভোট গ্রহণের তারিখ	১৬ পৌষ ১৪২৫ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮	রবিবার

প্রধান নির্বাচন কমিনার তাঁর ভাষণে জানান, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনি ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কমিশনের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রার্থীদের তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং নির্বাচনের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি আদান-প্রদান পদ্ধতি সংক্রান্ত সফটওয়্যার, প্রোগ্রাম আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। সরাসরি অথবা অনলাইনেও মনোনয়নপত্র দাখিলের বিধান রাখা হয়েছে। পুরাতন পদ্ধতির পাশাপাশি ভোটগ্রহণে ইলেকট্রিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৬টি আসনে ইভিএমে ভোট গ্রহণ করা হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২৬শে নভেম্বর ২০১৮ তারিখে সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে সিটি করপোরেশন ও জেলা সদর সংশ্লিষ্ট ৪৮টি সংসদীয় এলাকা থেকে কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে দৈবচয়নে ৬টি আসন নির্ধারণ করা হয়েছে। আসনসমূহ হলো– ১৮৬ ঢাকা-১৩, ১৭৯ ঢাকা-৬, ২৮৬ চট্টগ্রাম-৯, ২১ রংপুর-৩, ১০০ খুলনা-২ ও ১০৬ সাতক্ষীরা-২।

ইতোমধ্যে ইলেকট্রিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম বিষয়ে সর্বসাধারণের জন্য ১২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইভিএম প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল নির্বাচন কমিশন। এর উদ্‌বোধন করেছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা। এতে নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকার বিজি প্রেস থেকে মনোনয়ন ফরম, রশিদ বই, প্রতীকের পোস্টার নমুনা, আচরণবিধির ফরমসহ প্রাথমিক নির্বাচনি প্রচারসামগ্রী জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। ইতোমধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশন সংসদীয় আসনের ভোটার সংখ্যা নির্ধারণ করে আসনভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকা অনুযায়ী বাংলাদেশের ৩০০ সংসদীয় আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচনে এবার ভোটার সংখ্যা ১০ কোটি ৪১ লাখ ৯০ হাজার ৪৮০ জন। এরমধ্যে পুরুষ ৫ কোটি ২৫ লাখ ৪৭ হাজার ৩২৯ জন ও নারী ৫ কোটি ১৬ লাখ ৪৩ হাজার ১৫১ জন।

নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে ৩৯টি। ছোটো-বড়ো সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলই নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে। পুনঃতফসিল অনুযায়ী ২৮শে নভেম্বর ২০১৮ ছিল মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ।

ইসির হিসাব অনুযায়ী তিনশ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ (নৌকা) ২৬৪ আসনে ২৮১ জনকে দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে এবং বাকি ৩৬টি আসনে দলীয় মনোনয়ন দেয়নি। বিএনপি (ধানের শীষ) ২৯৫ আসনে ৬৯৬ জনকে দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে আর বাকি ৫টি আসনে দলীয় মনোনয়ন দেয়নি। জাতীয় পার্টি-জাপা (লাঙ্গল) ২৩৩, জাতীয় পার্টি-জেপি (বাইসাইকেল) ১৭, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট

১২ই নভেম্বর ২০১৮, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইভিএম প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার

পার্টি-সিপিবি (কাস্তে) ৭৭, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ (মই) ৪৯, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ (মশাল)-৫৩, গণফোরাম (উদীয়মান সূর্য) ৬১, বিকল্পধারা বাংলাদেশ (কুলা)-৩৭, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (তারা) ৫১, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (হাতপাখা) ২৯৯, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (বটগাছ) ২৬, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ (গামছা) ৩৭, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি–এলডিপি (ছাতা) ১৫, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল-এমএল (চাকা) ৩, গণতন্ত্রী পার্টি (কবুতর) ৮, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (কুড়েঘর) ১৪, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি (হাতুড়ি) ৩৩, জাকের পার্টি (গোলাপ ফুল) ১০৮, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি (গরুর গাড়ি) ১১, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন (ফুলের মালা) ২০, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (হারিকেন) ৪৯, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (আম) ৯০, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ (খেজুর গাছ) ১৫, গণফ্রন্ট (মাছ) ১৬, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল-পিডিপি (বাঘ) ১৬, বাংলাদেশ ন্যাপ (গাভি) ৪, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (কাঁঠাল) ১৩, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ (চেয়ার) ২৮, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি (হাতঘড়ি) ৫, ইসলামী ঐক্যজোট (মিনার) ৩২, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (রিকশা) ১২, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট (মোমবাতি) ২১, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা (হুক্কা) ৬, বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি (কোদাল) ৩০, খেলাফত মজলিশ (দেয়ালঘড়ি) ১২, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল (হাতপাঞ্জা) ১৭, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (ছড়ি) ১ ও বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফের (টেলিভিশন) ৭১ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছেন। স্বতন্ত্র ৪৯৮ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছেন। এবার নির্বাচনে ৩ হাজার ৬৫ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছেন। এরমধ্যে অনেক আসনে একই দলের একাধিক প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনের নিয়োজিত রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাই ২রা ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে। বাছাইয়ে মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া প্রার্থী নির্বাচন কমিশনে আপিল করতে পারবেন। কোনো প্রার্থী ইচ্ছা করলে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতেও পারবেন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই। তারপর রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় মনোনীত প্রার্থী চূড়ান্ত হবে। ভোট গ্রহণ ৩০শে ডিসেম্বর ২০১৮।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পুনঃতফসিল ঘোষণার পর বাংলাদেশে নির্বাচনি পরিবেশ উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে। নিবন্ধিত সকল রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়ন নির্বাচনি পরিবেশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। যাদের রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন নেই তারাও স্বতন্ত্র অথবা অন্য কোনো দলের বা জোটের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

শুরু হয়েছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কার্যক্রম। নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ করা গেছে। নিজ নিজ সমর্থকদের নিয়ে বিপুলসংখ্যক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা হয়েছে সুশৃঙ্খলভাবে। সবার প্রত্যাশা– অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন।

গণতন্ত্রে জনগণই রাষ্ট্রের মালিক। জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণ নির্বাচনে সৎ, যোগ্য ও দায়িত্বশীল প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন, যারা বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। অবশ্য এজন্য নিশ্চিত করতে হবে স্বাভাবিক পরিবেশ। যাতে জনগণ নির্ভয়ে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন নির্বাচন কমিশনসহ সকল সংস্থা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন– মর্মে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাঁর ভাষণে অঙ্গীকার করেছেন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এই উৎসবমুখর পরিবেশ অব্যাহত থাকুক শুধু নির্বাচনের দিন পর্যন্ত নয়, নির্বাচন-উত্তরও। পরিস্থিতি থাকুক সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা আবশ্যক। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকলকে মেনে চলতে হবে নির্বাচনি বিধি-বিধানসহ প্রচলিত আইন-কানুন ও নিয়মনীতি। যাতে কোনো অপশক্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে–সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সকলকে। বাঙালি বীরের জাতি। বীর বাঙালি সতর্ক থাকলে সুষ্ঠু নির্বাচনে কোনো অপশক্তি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পন্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রেও আমাদের মডেল হওয়া সম্ভব। আমাদের প্রতীতি হলো, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন; যাতে গণতন্ত্র, শান্তি, সহাবস্থান ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের আসন বিশ্বসভায় প্রোজ্জ্বলভাবে সুদৃঢ় ও ঋদ্ধ হোক।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

বাংলাদেশের গণহত্যা একটি রক্তাক্ত পতাকা

বদরু মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ও যুদ্ধের একটি অংশ এবং তা বিশ্ব রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাইরের কিছু নয়। ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের ঢেউ আর ফারসি বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আছড়ে পড়েছিল অবিভক্ত ভারতবর্ষেও। আর তাই ভারতের মুক্তিসংগ্রাম থেকে ১৯৪৭ সাল পরবর্তী পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসা বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসা নেতা-কর্মীদের নিয়ে ১৯৪৯-এর ২৩শে জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। এক পর্যায়ে আওয়ামী মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বর্জন করা হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ হয়ে যায় আওয়ামী লীগ। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাওয়ার পর থেকে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি পর্যায়ক্রমে জোরদার হতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-আন্দোলন, '৭০-এর নির্বাচন একটি ধারাবাহিক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস।

একাত্তরের গণহত্যার খণ্ডচিত্র

'৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পার্লামেন্টের অধিবেশন না ডেকে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা নির্যাতন, হত্যা ও জ্বালাও-পোড়াও নীতি গ্রহণ করে। সামরিকবাহিনীর প্রধান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যথাসময়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে আওয়ামী লীগের ডাকে গোটা দেশে অসহযোগ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন থেকে শুরু করে সর্বস্তরে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এরই এক পর্যায়ে ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ডাক, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' একটি অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ৭ই মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বৃহৎ সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান-ঢাকা কেন্দ্র থেকে সরাসরি প্রচার হতে থাকে। এক পর্যায়ে ইয়াহিয়া জান্তার হস্তক্ষেপে ভাষণটির প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে সারাদেশে একটি নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গণরোষের মুখে পরদিন অর্থাৎ ৮ই মার্চ সকালে রেকর্ডকৃত ভাষণটি রেডিও প্রচার করতে বাধ্য হয়। ইয়াহিয়া খানের আলোচনার নামে টালবাহানার এক পর্যায়ে ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা শহরগুলোতে জ্বালাও-পোড়াও ও হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে রাখার ঘটনাটি বাংলার আপামর জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাড়তি প্রেরণা জোগায়।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এতটাই তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে, সাধারণ জনগণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে এসেছিল শহর থেকে গ্রামে। স্লোগান উঠেছিল, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', কিংবা 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা'। আর এই স্লোগানকে সামনে রেখে সবচেয়ে সামনে এসেছিল বাংলার ছাত্র-শ্রমিক-জনতা।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে সামরিকবাহিনী প্রথমে জেলা শহর ও পরবর্তীতে গ্রামগঞ্জে ঢুকে জ্বালাও-পোড়াও আর হত্যাকাণ্ড চালাতে শুরু করে। পাশাপাশি হানাদারদের প্রতিরোধে শহরে ও গ্রামে মুক্তির লক্ষ্যে গড়ে ওঠা সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে পথেঘাটে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। হানাদারদের দোসর হিসেবে সামনে আসে জামায়াতে ইসলামি ও মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গড়ে ওঠা শান্তি কমিটি, আলবদর ও আলশামস-এর মতো সহযোগী বাহিনী। '৭০-এর নির্বাচনের পর থেকে মুক্তিকামী বাঙালিদের রুখতে ঢাকা থেকে শুরু করে প্রথমে জেলা শহর, পর্যায়ক্রমে মহকুমা শহর পার হয়ে পাকসেনারা গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। চলতে থাকে মুক্তিকামী জনগণের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধ আর খানসেনা ও তাদের দোসরদের পক্ষ থেকে জ্বালাও-পোড়াও আর নির্মম হত্যাকাণ্ড।

১৯৭০-এর ২৫শে মার্চ পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নামে পাক হানাদারবাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে যে নারকীয় গণহত্যা শুরু করেছিল তা অব্যাহত ছিল '৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত। পাকবাহিনীর এই হত্যাযজ্ঞের যে নীলনকশা তৈরি করা হয়েছিল তারমধ্যে ঢাকার ৪টি স্থান বেছে নিয়েছিল তারা। এরমধ্যে বঙ্গবন্ধুর বাসভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস ও তৎকালীন পিলখানা ইপিআর হেডকোয়ার্টার। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ২৫শে মার্চ রাত বারোটায় উল্লিখিত ৪ স্থানে অতর্কিত হামলা চালানো হয়। এই চারটি স্থান ছাড়াও অপারেশন সার্চলাইটের আওতাভুক্ত ছিল রাজশাহী, যশোর, খুলনা, রংপুর, সৈয়দপুর, কুমিল্লা, সিলেট ও চট্টগ্রাম এলাকা। পর্যায়ক্রমে গোটা বাংলাদেশে পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের গণহত্যার মহোৎসব শুরু হয়।

ইদানীং সংখ্যাতত্ত্বের প্রশ্নটি সামনে এনে '৭১-এর গণহত্যাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে কোটি কোটি মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে অমর্যাদা করা হচ্ছে। সংখ্যাতত্ত্বের বিতর্কে না গিয়েও আমরা অস্ট্রেলিয়ার পত্রিকা *হেরাল্ড ট্রিবিউনে* প্রকাশিত একটি খবরের কথা বলতে পারি। খবরের রিপোর্ট অনুসারে শুধু ২৫শে মার্চের রাতেই পাকবাহিনী ঢাকা শহরে ১ লক্ষ লোককে হত্যা করেছিল। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞকে বিংশ শতাব্দীর ৫টি গণহত্যার অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক *টাইম* ম্যাগাজিনের ড্যান কলিন একজন পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন– 'We can kill anyone for anything. We are accountable to no one'. বিশ্ববিখ্যাত এই পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেছে এভাবে– 'It is the most incredible, calculeted thing since the days of the Nazis in Poland'. পাকিস্তানি জেনারেল রাও ফরমান আলির ডায়রিতে লিখেছেন– 'Paint the green East Pakistan red'. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত *হেরাল্ড ট্রিবিউন* পত্রিকার ভাষ্যানুসারে, 'পাকিস্তানের গণহত্যা থেকে রেহাই পেতে লাখ লাখ উদ্বাস্তু মুসলমান ও অন্যান্যরা স্রোতের মতো ভারতে চলে আসছে।' বিশিষ্ট লেখক রবার্ট পেইন তাঁর *Massacre* গ্রন্থে ইয়াহিয়া খানের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে– 'Kill three million of them and rest will eat out of our hands'.

ঢাকার হত্যাকাণ্ডের মূল কেন্দ্রস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাক শাসকদের বিমাতাসুলভ আচরণে ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন ও মুক্তির সংগ্রামে মূল প্রেরণাদাতা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরাই। তাই মেধা বিকাশ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল পাকসেনাদের টার্গেটগুলোর মধ্যে অন্যতম। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকসেনাদের একটি দল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্যবহৃত এম-২৪ ট্যাংক নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়ে। ব্রিটিশ কাউন্সিল দখলে নিয়ে আশপাশের ছাত্রাবাসগুলোতে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। আকস্মিক এই হামলায় তৎকালীন ইকবাল (বর্তমানে জহুরুল হক হল) হলে প্রায় ২০০ ছাত্র শহিদ হন। ঐসব শহিদদের লাশ দুদিন পরেও তাদের ভস্মীভূত রুমের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা যায়। অনেক লাশ পুকুরে ভেসে থাকতে দেখা যায় এবং চারুকলার একজন হতভাগ্য ছাত্রের লাশ পড়ে থাকে তাঁর ক্যানভাসের সামনেই।

শিক্ষকদের মধ্যে ৯ জন শিক্ষক ঐ কালরাতে তাঁদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বরাদ্দকৃত বাসাতেই পাকসেনাদের গুলি ও বেয়নেটের খোঁচায় নির্মমভাবে শহিদ হন। ২৫শে মার্চ রাতে শহিদ শিক্ষকগণ হলেন– দর্শন বিভাগের অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, পরিসংখ্যান বিভাগের এএনএম মুনীরুজ্জামান, ভূতত্ত্ব বিভাগের আব্দুল মুকতাদির, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, ইতিহাস বিভাগের গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, ইংরেজি বিভাগের জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের আতাউর রহমান খান খাদিম, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের ফজলুর রহমান খান, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ সাদেক ও গণিত বিভাগের অধ্যাপক শরাফত আলী।

১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ থেকে চূড়ান্ত বিজয় লাভের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহিদ হন ২০ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা, জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র ৪১ জন, সলিমুল্লাহ্ হল, ফজলুল হক হল, শহীদুল্লাহ্ হল, জহুরুল হক হল, সূর্যসেন হল, হাজী মুহম্মদ মহসীন হলের ১০১ জন শহিদের নাম পাওয়া গেছে। বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের নাম পাওয়া গেছে ২৮ জনের। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সারাদেশের নারকীয় হত্যাযজ্ঞে শিক্ষক, ছাত্র, চিকিৎসক, শ্রমিক, কৃষকসহ লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ শহিদ হন পাকসেনা ও তাদের এদেশীয় দালালদের হাতে। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বিজয় দিবস রজতজয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৯৬ সূত্রে প্রাপ্ত)।

এখানে উল্লেখ্য যে, ২৫শে মার্চ রাতে পাক জান্তার হাত থেকে রক্ষা পেতে ১২ সদস্যের একটি পরিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে একটি বাড়িতে আশ্রয় নিলে তারাও নির্মমভাবে শহিদ হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন হত্যাযজ্ঞ চলছিল ঠিক সেই সময়ে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে পাক সেনারা ট্যাংক থেকে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। পাকসেনারা পুলিশ লাইনসের ভিতরে ঢুকে আবাসিক ভবনগুলোও গুঁড়িয়ে দেয়। শহিদ হন অসংখ্য পুলিশ সদস্য। পুলিশ সদর দপ্তরে তখন ১১০০ পুলিশ সদস্য বাস করতেন, তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক পুলিশ সদস্য প্রাণে বেঁচে যান।

২৬শে মার্চ মধ্য দুপুরে পাকসেনারা অতর্কিতে পুরনো ঢাকার আবাসিক এলাকাগুলোতে ঢুকে পড়ে। ইংলিশ রোড, ফ্রেন্স রোড, নয়াবাজার, সিটি বাজারসহ বিভিন্ন অলিগলিতে ঢুকে হানাদারবাহিনী অসংখ্য নারী-পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। ঢাকার বৃহত্তম হত্যাযজ্ঞ চলে পুরনো ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায়।

ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী ছাড়াও পাক জান্তারা হত্যা করে লেখক, সাংবাদিক, ম্যাজিস্ট্রেট, চিকিৎসকসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার জনগণকে। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা ও তৎকালীন মহকুমা শহরগুলোতে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চলে তার সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব সুচারুভাবে করা হয়ত বা কঠিন। তবে শহরগুলোর বাইরেও বাংলাদেশের বৃহত্তম হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয় খুলনার চুকনগরে। চুকনগরে গণহত্যাটি সংঘটিত হয় ১৯৭১-এর ২০শে মে। বৃহত্তর খুলনা ও বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হিন্দু শরণার্থীরা সাতক্ষীরা সীমান্ত ব্যবহার করে ভারতে যাওয়ার জন্য নদী ও হাঁটাপথে রওনা দিয়ে চুকনগর ও তার পার্শ্ববর্তী ৩-৪ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে জড়ো হয়। এই খবর পেয়ে সাতক্ষীরা আর্মি ক্যাম্প থেকে পাকবাহিনীর ২টি গাড়ি চুকনগর চলে আসে এবং নির্বিচারে বিভিন্ন জায়গায় একত্রিত হওয়া মানুষের প্রতি গুলি ছোড়ে। এক হিসাব মতে, এখানে ১০ হাজারের মতো নারী-পুরুষ ও শিশু পাকবাহিনীর গুলিতে শহিদ হন। অনেকেই এই হত্যাকাণ্ডকে মাইলাই হত্যাকাণ্ডের সাথে তুলনা করেছেন।

এছাড়া পার্শ্ববর্তী তালা উপজেলার পারকুমিরা, হরিণখোলা ও জালালপুর বধ্যভূমিতে অসংখ্য হিন্দু-মুসলমানকে পাক মিলিশিয়া ও রাজাকারবাহিনী নির্বিচারে হত্যা করে। সত্যি কথা বলতে গেলে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামই এক একটি বধ্যভূমি। এমন কোনো গ্রাম খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে খানসেনা ও তাদের দোসরদের হাতে বাঙালি আদম সন্তানের লাশ পড়েনি।

বাংলাদেশের ইতিহাস মানেই রক্তাক্ত ইতিহাস। সে ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা আছে লক্ষ লক্ষ শহিদের নাম। নাম জানা ও অজানা অনেকেই এখন বিস্মৃতির আড়ালে।

যাঁদের রক্তের ওপর আমরা আজ দাঁড়িয়ে রয়েছি তাঁদের প্রতি আমাদের রয়েছে অনেক ঋণ। শুধরাবার একটিই পথ– ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের সাথে সাথে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে সুচারুরূপে বাস্তবায়ন।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

মুক্তিযুদ্ধের মঞ্চ নাটক

মিজানুর রহমান মিথুন

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে সবচেয়ে বেশি বিকশিত হয়েছে শিল্পকলার অন্যতম মাধ্যম মঞ্চ নাটক। মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশ নেওয়া একদল তরুণ নিরলস শ্রম,সাধনা এবং সাহস ও গভীর মমতায় তৈরি করেছে এসব অসাধারণ নাটক। এসব মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক মঞ্চ নাটক পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে চেতনার আলো জ্বালাবে যুগের পর যুগ।

ঠিক স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে (নব্বই দশক অবধি) মঞ্চ নাটকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিভিন্ন আঙ্গিকে রূপায়িত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দু'একটি মুক্তিযুদ্ধের নাটক আলোচিত হলেও সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে এর প্রেক্ষাপট নিয়ে তুলনামূলক বেশি নাটক হয়েছে। মঞ্চস্থ হওয়া মুক্তিযুদ্ধের নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ, জয় জয়ন্তী, একাত্তরের পালা, মুখোশ, কিংশুক, যে মরুতে, বিবিসাব, সময়ের প্রয়োজনে, কথা ৭১, খারন্নি, বলদ* প্রভৃতি। তবে নূরুলদীনের *সারাজীবন, কোর্ট মার্শাল, সাতঘাটের কানাকড়ি* ইত্যাদি নাটকও মুক্তিযুদ্ধের নাটক হিসেবে সমধিক বিবেচিত। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত নাটকসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সার্থক, মঞ্চ সফল ও আলোচিত নাটক হচ্ছে সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক রচিত *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*। বিবিসি'তে কর্মরত অবস্থায় ১৯৭৫ সালের ১লা মে থেকে শুরু করে ১৩ই জুনের মধ্যে লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড শহরে বসে সৈয়দ শামসুল হক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঘটে যাওয়া একটি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রচনা করেন তাঁর লেখা প্রথম নাটক এবং আমাদের মঞ্চ নাটকে প্রথম কাব্য নাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*। তিনি তাঁর এ নাটকে এদেশের শত্রুমুক্ত হওয়ার সময়ে একটি প্রত্যন্ত গ্রামের একদিনের চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর আঞ্চলিক ভাষায় রচিত অসাধারণ সব কাব্যিক সংলাপ এ নাটকের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। নাটকের সংলাপে ব্যবহৃত প্রতীক ও উপমা সবই গ্রামীণ জীবন থেকে তুলে এনেছেন। আবদুল্লাহ আল মামুনের নির্দেশনায় থিয়েটার ১৯৭৬ সালের ২৫শে নভেম্বর মহিলা সমিতির মিলনায়তনে নাটকটির প্রথম প্রদর্শন করে। আবদুল্লাহ আল মামুন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন কাব্যনাটক নিয়ে কাজ শুরু করেন। এটি কাব্যনাট্য না গীতিনাট্য এই দু'য়ের দ্বিধাদ্বন্দ্বে ঐ সময়ে থিয়েটার-এর অনেক সদস্যই নাটকটি মঞ্চে না আনার জন্য নানা যুক্তি দেখিয়ে আসছিল। পরে আবদুল্লাহ আল মামুন, ফেরদৌসী মজুমদার ও রামেন্দু মজুমদার মিলে নাটকটির কাজ শুরু করেন। ফলে সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের মঞ্চ পেল জীবনবোধের গভীরতায়, ভাষায়, গীতিময়তায় ও নাটকীয় পরিবেশ সম্পৃক্ত আমাদের সাহিত্যে অসাধারণ নাট্যকর্ম *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মঞ্চ নাটকের একটি দৃশ্য

নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের নাটক *কোপেনিকের ক্যাপ্টেন* (১৯৮১ সালের একেবারে শেষ দিকে) দেখতে গিয়ে সৈয়দ শামসুল হক নাটকটির মঞ্চ পরিকল্পনা এবং অভিনয় দেখে এতটাই অনুপ্রাণিত হন যে, সে রাতেই বাড়ি ফিরে লেখেন বহুদিন থেকে ভেবে রাখা কাব্যনাটক *নূরুলদীনের সারাজীবন*। স্বাধীনতা-উত্তর বিপন্ন সময়কে উত্তরণের লক্ষ্যে দু'শতাধিক পুরোনো ইতিহাসকে সৈয়দ শামসুল হক *নূরুলদীনের সারাজীবন* নাটকে রংপুরের বীর কৃষকনেতা নূরুলদীনকে তুলে এনেছেন। ১৭৮৩ সালের রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলের সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কৃষকনেতা নূরুলদীনের সংগ্রাম, সাহস আর ত্যাগ নিয়ে গড়ে উঠেছে নাটকটি। আলী যাকেরের নির্দেশনায় এই নাটকের প্রথম প্রদর্শনী হয় ১৯৮২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর মহিলা সমিতি মঞ্চে। নূরুলদীনের ব্রিটিশ বিরোধিতার সঙ্গে সৈয়দ শামসুল হক অসামান্য নৈপুণ্য মিলিয়ে দিয়েছেন ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের ঔপনিবেশবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামকে। রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত ব্যতিক্রমী এই কাব্য নাটকটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ১৭৮৩, ১৯৫২ বা ১৯৭১ সালের বাঙালি জাগরণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ সাল– এই দীর্ঘ সময় নিয়ে নাট্যব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দিন ইউসুফ রচনা করেন মুক্তিযুদ্ধের নাটক *একাত্তরের পালা*। মাত্র তিন মাস মহড়ার পর তাঁরই নির্দেশনায় ১৯৯৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর মহিলা সমিতির মঞ্চে থিয়েটার-এর ২৩তম প্রযোজনা হিসেবে মঞ্চস্থ হয় *একাত্তরের পালা*। আমাদের জাতীয় জীবনের মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বেদনা ও বিদ্রোহ সতত সঞ্চরণশীল, তারই মর্মভেদী মঞ্চরূপ হলো *একাত্তরের পালা*। এই নাটকটি শুধু ঢাকা থিয়েটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ যাবৎকাল দেশের ৭০-৮০টি নাট্যদল *একাত্তরের পালা* মঞ্চে এনেছে।

মুক্তিযুদ্ধের ভিন্নতর প্রেক্ষাপট নিয়ে অলোক বসু'র রচিত নাট্যধারার

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক *ঘরামি*। মাসুদ পারভেজের নির্দেশনায় প্রথমে এই নাটকটি মঞ্চে আসে ২০০২ সালে। পরবর্তীতে সাখাওয়াত লিটুর নির্দেশনায় নাট্যধারার দশম প্রযোজনাটি পুনরায় মঞ্চে আসে ২০০৭ সালের ২৭শে জুন। ১৯৭০ সালে মুক্তিযুদ্ধের আগে বরিশাল জেলায় রাজিরহার নামে একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে *ঘরামির* গল্প।

নাট্যব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ আল মামুনের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম *বিবিসাব*, জামালউদ্দিন হোসেনের নির্দেশনায় প্রথম মঞ্চে আনে ঢাকা সুবচন ১৯৯৪ সালে। একটানা পাঁচ বছর মঞ্চায়নের পর ঢাকা সুবচনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলে নাগরিক নাট্যাঙ্গন অনাসাম্বল জামালউদ্দীন হোসেনের নির্দেশনায় পুনরায় মঞ্চে আনেন তাদের দশম প্রযোজনা *বিবিসাব*। পুরনো ঢাকার এক সাধারণ মহিলার মুক্তিযুদ্ধে মহান আত্মত্যাগ ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম নাটকটির মূল উপজীব্য। ১৯৭১ সালে কীর্তনীয়া দলের জীবনযুদ্ধ, হিন্দুপাড়ার অবস্থা, যুদ্ধের সময় সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে যাওয়াসহ যুদ্ধ কেন্দ্র করে নানা সমস্যার দিকগুলো উঠে এসেছে মামুনুর রশীদের রচনা ও নির্দেশনায় *জয়জয়ন্তী* নাটকে। ১৯৯৫ সালের ২২শে নভেম্বর টাঙ্গাইলের ভাসানী হলে নাটকটির প্রথম প্রদর্শনী হয়।

মুক্তিযুদ্ধকে যখন সবাই ভুলে যেতে চায়, মুক্তিযোদ্ধারা যখন দেশের ক্রান্তিকাল দেখেও নিশ্চুপ থাকেন তখন মুক্তিযুদ্ধের একজন শহিদ বুদ্ধিজীবীর স্ত্রী এক ঘৃণ্য রাজাকারকে বিয়ে করতে চায় মুক্তিযোদ্ধাদের আঘাত হানতে। এমনই গল্প নিয়ে সৈয়দ শামসুল হকের লেখা সাড়া জাগানো নাটক *যুদ্ধ এবং যুদ্ধ* মঞ্চে আসে ১৯৮৬ সালের ১৩ই আগস্ট মহিলা সমিতির মঞ্চে। তারিক আনাম খানের নির্দেশনায় নাটকটি উপস্থাপনার ঢং ছিল চমৎকার, সর্বোপরি মঞ্চে কোলাজ হয়ে এসেছে নাটকটি। যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে থাকাকালীন তৎকালীন দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কিছু গল্প লেখার কথা ভাবলেন ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। অল্প কিছুদিনের মাঝে মুক্তিযুদ্ধে মানুষের ত্যাগ, বীরত্ব, মহত্ত্ব আর ভালোবাসাকে নিয়ে লিখে ফেললেন বেশকিছু গল্প। তারই পাশাপাশি মেরুদণ্ডহীন, ভীরু, কাপুরুষ, চাটুকার, লোভী আর নির্বোধ রাজাকারদের নিয়ে লিখলেন গল্প *বলদ*। ২০০২ সালের ২২শে অক্টোবর থিয়েটার আরামবাগ নামে নাট্যদলটি গাজী রাকায়েতের নাট্যরূপে তাদের ২৬তম প্রযোজনা হিসেবে মঞ্চে আনে *বলদ*। ২ ঘণ্টা ব্যাপ্তিকালের এই নাটকটির নির্দেশনার মাধ্যমে ১৩ বছর পর মঞ্চে ফিরেন খ. ম. হারুন। এর আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে তারই প্রযোজনা ও পরিচালনায় প্রথমবারের মতো *বলদ* গল্পের নাট্যরূপ প্রচারিত হয় ২০০০ সালে। *বলদ* গল্পে ষাড় থেকে বলদ করার গ্রামবাংলার যে প্রথাটি লেখক তুলে ধরেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধে তার যে প্রয়োগ তা সত্যিই অসাধারণ। জহির রায়হানের অসাধারণ ছোটোগল্প সময়ের প্রয়োজনে নিয়ে মোহাম্মদ বারীর নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় নাট্যদল থিয়েটার আর্ট ইউনিট তাদের দশম প্রযোজনা হিসেবে ২০০৫ সালের ২৪শে জুলাই মহিলা সমিতির মিলনায়তনে মঞ্চস্থ করে *সময়ের প্রয়োজনে*। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন একটি ক্যাম্পের একদল তরুণ মুক্তিযোদ্ধার প্রতিদিনের জীবনযাপন, আশা-হতাশা, আনন্দ-বেদনার গল্প হলো *সময়ের প্রয়োজনে*। *পালাকারের রাইফেল* নাটকটির শিল্পমান বেশ প্রশংসনীয়। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনেক মঞ্চ ও পথনাটক বিভিন্ন দল কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে মঞ্চায়িত হয়েছে। কিন্তু এরমধ্যে খুব অল্প-সংখ্যক নাটকই শিল্পমান বিচারে সার্থকতা পেয়েছে। কোনো কোনো নাটকে শিল্পের চেয়ে বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বেশি। আলোচ্য নাটকগুলো ছাড়াও মামুনুর রশীদ রচিত *সমতট*, মমতাজ উদ্দিন আহমদের *কি চাহ শঙ্খচিল* ও *রাজা অনুস্বারের পালা*, সৈয়দ শামসুল হকের *তোরা জয়ধ্বনি কর*, আবদুল্লাহ আল মামুনের *তোমরাই ও দ্যাশের মানুষ*, মান্নান হীরার একাত্তরের *ক্ষুদিরাম ও ফেরারি নিশান*, নাসিরউদ্দিন ইউসুফের *ঘুম নেই*, নীলিমা ইব্রাহিমের আমি বীরঙ্গনা বলছি অবলম্বনে *শামুক বাস*, শহিদ জননী জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলি থেকে নির্বাচিত অংশ অবলম্বনে শ্রুতি নাটক *স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ*, হুমায়ূন আহমেদের *১৯৭১*, শান্তনু বিশ্বাসের *ইনফরমার*, সেলিম আল দীনের *নিমঞ্জন*– এ নাটকে শুধু স্বদেশের মুক্তির কথাই বলা হয়নি সমগ্র পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের ইচ্ছের কথা বলা হয়েছে এবং দুনিয়াজুড়ে গণহত্যার এক দলিল উপস্থাপিত হয়েছে নাসিরউদ্দিন ইউসুফ নির্দেশিত এ নাটকে। এছাড়াও যুদ্ধপূর্ব সময়ে মঞ্চস্থ হওয়া *এবারের সংগ্রাম* ও *স্বাধীনতার সংগ্রাম* নাটক দুটিও উল্লেখযোগ্য।

এদিকে গোলাম সারোয়ারের রচনা ও পদাতিক নাট্য সংসদের প্রযোজনায় *ক্ষেত মজুর খইমুদ্দিন* বিদেশি গল্প অবলম্বনে রচিত হলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথাই উপস্থাপিত হয়েছে নাটকটিতে। থিয়েটার আর্ট ইউনিটের প্রযোজনায় এ নাটকটি বেশ দর্শকপ্রিয়তা লাভ করে।

লোকনাট্যদল টিএসসি'র *একাত্তরের দিনগুলি* এবং *ডেটলাইন জগন্নাথ হল* মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত অসাধারণ দুটি মঞ্চ নাটক। আবদুল হালিম আজিজ রচিত *দৃষ্টিপাতের হানাদার*, বহুবচনের *আবার যুদ্ধ* মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নাটক। স্বপ্নদলের প্রযোজনায় বাদল সরকারের *ত্রিংশ শতাব্দী* নাটকে জাপানের হিরোশিমার যুদ্ধের ভয়াবহতার পাশাপাশি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা উঠে এসেছে। ঢাকা থিয়েটারের প্রযোজনায় সেলিম আল দীনের *নিমজ্জন* নাটকে পৃথিবীর বিভিন্ন গণহত্যার ইতিহাস তুলে আনতে গিয়ে বাংলাদেশের একাত্তরের ভয়াবহতার কথা উঠে এসেছে। নাট্য সংগঠন নাটকের প্রযোজনায় *তমসা* নাটকটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে নির্মিত হলেও পুরো নাটকের অবয়বে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের *নানাদিক*।

ড. ইনামুল হক রচিত লাকী ইনাম নির্দেশিত ও নাগরিক নাট্যাঙ্গন প্রযোজিত *সেইসব দিনগুলি* মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। স্বপ্নদলের প্রযোজনা *ফেস্টুনে লেখা স্মৃতি* একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক। প্রয়াত নাট্যকার সেলিম আল দীনের স্মৃতিকথা অবলম্বনে এর নাট্যরূপ দিয়েছেন জাহারাবী রিপন এবং নির্দেশনা দিয়েছেন যৌথভাবে সামাদ ভূঞা ও রওনক লাবনী। নটরণ মঞ্চায়ন করে তাদের প্রথম প্রযোজনা *অমাবস্যার কারা*। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই নাটকে ১৫ জন নারীসহ মোট ১৮ জন শিল্পী অভিনয় করেছেন। নাটকটি রচনা করেছেন কুমার প্রীতীশ বল, নির্দেশনা দিয়েছেন দেবাশীষ ঘোষ। টিএসসিভিত্তিক নাট্যসংগঠন স্বাপ্নিক থিয়েটারের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রযোজনা *ইদু কানার বউ*। কথাশিল্পী নাজিব ওয়াদুদের ছোটোগল্প অবলম্বনে এর নাট্যরূপ ও নির্দেশনা দিয়েছেন এইচএম তানভীর হাসান।

আলোচ্য নাটকগুলো ছাড়াও মামুনুর রশীদ রচিত সমতট, মমতাজ উদ্দিন আহমদের *কি চাহ শঙ্খচিল* ও *রাজা অনুস্বারের পালা*, মান্নান হীরা রচিত *ফেরারি নিশান*, ফাল্গুনী হামিদের *হায়েনা*, অলোক বসুর *হনন*, আবদুল হালিম আজিজের *হানাদার* ইত্যাদি নাটক এবং *কিংশুক*, *যে মরুতে*, *যুদ্ধ এবং যুদ্ধ*, *খারন্নি*, *মুখোশ*, *সাতঘাটের কানাকড়ি*, *কোর্ট মার্শাল*, *রাইফেল* ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সফল নাটক।

এখনো অনেক তরুণ নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা অবলম্বনে নতুন নতুন মঞ্চ নাটক নিয়ে আসছেন।

লেখক: সহ-সম্পাদক, জাগোনিউজ২৪.কম

একাত্তরের বুদ্ধিজীবী হত্যা নরপশুদের অপকীর্তি

মো. রুহুল আমিন

অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা। ৩০ লক্ষ বাঙালির রক্ত ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা দীর্ঘ ৯ মাস পাকিস্তানি সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এদেশ স্বাধীন করেছি। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে আমাদের বিজয় অর্জিত হয়।

ঠিক এর পূর্ব মুহূর্তে ১০ থেকে ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে পাকিস্তান সামরিক জান্তার এদেশীয় দালাল স্বাধীনতার বিরুদ্ধশক্তি রাজাকার, আলশামস, আলবদর বাহিনী ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যায় মেতে ওঠে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা নিজেদের পরাজয় অনিবার্য জেনেই এদেশীয় গুপ্তঘাতক ফ্যাসিস্ট গ্রুপের সক্রিয়তায় শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, শিল্পীসহ প্রায় দেড় শতাধিক বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিকে অপহরণ করে ঢাকা শহরতলীর বিভিন্ন বধ্যভূমিতে নিয়ে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক রশিদুল হাসান, ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য, রিডার ড. আবুল খায়ের ও গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ, শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের ড. সিরাজুল হক খান ও ড. ফয়জুল মহি, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আলিম চৌধুরী, সাংবাদিক শহিদুল্লাহ কায়সার, ডাক্তার ফজলে রাব্বি ও ডাক্তার মো. মর্তুজা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তারা এই ঘৃণ্য কাজটি করেছিল মূলত বিশিষ্ট জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত ও সমাজের বিবেক শ্রেণির মানুষকে বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনকারী বুদ্ধিজীবীদের চিহ্নিত করে দেশকে মেধাশূন্য করার জন্য। দীর্ঘ ৯ মাসে এরা সারা বাংলাদেশে শত শত চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, শিল্পী ও সাহিত্যিক, সংগঠক, সমাজকর্মী, রাজনীতিক, ছাত্রসহ অসংখ্য দেশের মেধা-দক্ষতাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে।

শহীদ বুদ্ধিজীবী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস সাধারণ নাগরিক, মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবী, সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী ও সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের ধরে নিয়ে হত্যার জন্য কিছু নির্দিষ্ট স্থানকে ব্যবহার করত। পরে এগুলো বধ্যভূমি হিসেবে পরিচিতি পায়।

বিভিন্ন সময়ে দেশের ৩৫টি স্থানকে বধ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলো সংরক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মোট কতগুলো স্থানকে বধ্যভূমি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সে সংক্রান্ত কোনো তালিকা পাওয়া যায় না; তবে ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি এদেশে প্রায় ৯৪২টি বধ্যভূমি শনাক্ত করেছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামে ১১৬টি স্থানকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহান স্বাধীনতাযুদ্ধকালে পাকিস্তানবাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত 'বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ' নামের একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) তৈরি করেছে, যাতে প্রথমে দেশের ১৭৬টি বধ্যভূমি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও পরে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে ১২৯টি বধ্যভূমি সংরক্ষণ এবং সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এগুলো হলো– ঢাকা জেলায় আটটি, রাজবাড়ী জেলায় তিনটি, ফরিদপুরে চারটি, নরসিংদীতে চারটি, মুন্সীগঞ্জে পাঁচটি, টাঙ্গাইলে দুটি, শেরপুরে দুটি, কিশোরগঞ্জে এগারোটি, ময়মনসিংহে নয়টি, মানিকগঞ্জে একটি, শরীয়তপুরে একটি, গাজীপুরে একটি, জয়পুরহাটে পাঁচটি, নওগাঁয় সাতটি, রাজশাহীতে তিনটি, নাটোরে ছয়টি, পাবনায় একটি, বগুড়ায় চারটি, রংপুরে দুটি, লালমনিরহাটে একটি, গাইবান্ধায় নয়টি, পঞ্চগড়ে চারটি, ঠাকুরগাঁওয়ে চারটি, নীলফামারীতে ছয়টি, দিনাজপুরে একটি, চট্টগ্রামে এগারোটি, সুনামগঞ্জে দুটি, হবিগঞ্জে একটি, যশোরে তিনটি, ঝিনাইদহে দুটি, খুলনায় দুটি, পিরোজপুরে দুটি, বাগেরহাটে একটি ও ভোলায় একটি করে বধ্যভূমি রয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন বিজয়ের চূড়ান্ত লগ্নের দ্বারপ্রান্তে, দেশদ্রোহী ঘাতকেরা তখন অপহরণ করে নির্মমভাবে এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। শুধু মেধাশূন্য করে বাঙালি জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিতেই এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। জাতির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অভাব আর কোনোদিন পূরণ হবে না। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ততদিন এই বুদ্ধিজীবীদেরকে এ দেশের মানুষ সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করবে। আর ধিক্কার দেবে তাঁদের হত্যাকারী, লুণ্ঠনকারী পাকিস্তানি হায়েনাদের নিয়োগপ্রাপ্ত গুপ্তঘাতকদের।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও সাহিত্যিক

নিবন্ধ

বেগম রোকেয়া: নারীবাদী সংস্কারক

আফতাব চৌধুরী

নারী ও পুরুষ উভয়েই সমাজের অঙ্গ। তাই বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন লিখেছেন, নারী শুধু নারী বলে যাতনা ভোগ করা প্রকৃতির নিয়ম নয়। 'আমরা আল্লাহ ও মাতার নিকট ভ্রাতাদের 'অর্ধেক' নহি। তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক বন্দোবস্ত হইত–পুত্র যেখানে দশ মাস স্থান পাইবে, দুহিতা সেখানে পাঁচ মাস! পুত্রের জন্য যতখানি দুগ্ধ আমদানি হয়, কন্যার জন্য তাহার অর্ধেক! সেরূপ তো নিয়ম নাই'। রোকেয়া প্রকৃতি জগতের নিয়ম দেখিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যদি প্রকৃতিতে নারীর প্রতি সুবিধান থাকে ও তা মান্য করা না হয় তবে তা-ই অন্যায় এবং অবিবেচনা। তাই তিনি ভারতের নারীদের ঘুম থেকে জেগে উঠে দেশে-বিদেশে লেডি কেরানি, ব্যারিস্টার হয়ে উঠা নারী সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সৎ পরামর্শ দেন।

বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)

'আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করি, সংসারে আপন সম্ভাব্য পথ খুঁজিয়া লই। এক স্থানে আমি বলিয়াছি, 'ভরসা কেবল পতিতপাবন' কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন না-করিলে পতিতপাবনও ধরিয়া তুলিবেন না'। 'God helps those that help themselves'. পিতৃতন্ত্রের পরাক্রমের দহনে নারী হয়ে ওঠে বন্দিনী, হয়ে ওঠে স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি মাত্র। নারীকে তাই পুরুষ সম্পত্তির অধিকার দিতেও রাজি নন। ছলেবলে তাকে দু'হাত শূন্য বানানোই তাদের মতলব, কারণ তারা জানেন টাকা হাতে থাকলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়। তাই রমণীকে কপর্দকশূন্য করাই তাদের উদ্দেশ্য।

'... তাঁহাকে কেবল মূর্তিমতী কবিতা হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে–তাই তিনি মনোরমা কবিতা সাজিয়া থাকিতে চাহেন'। মেয়ের মা'ও তাই মেয়ের বয়স ও সৌন্দর্য বিষয়ে সচেতন থাকেন। বালিকার শরীরের ত্রুটি জানলে তাকে কেউ বিয়ে করবে না। রোকেয়া লিখেছেন–

> আমাদের স্কুলের কতিপয় বালিকার স্বাস্থ্যের রিপোর্ট তাহাদের মাতার নিকট এই অনুরোধসহ গেল যে, 'আপনারা অনুগ্রহপূর্বক শীঘ্র ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করুন'। তাহাতে তাহারা চটিয়া এই উত্তর দিলেন– স্কুল মে লড়কী পড়নে কো দিয়া হ্যায় না, বিচার করনে কো কে, আঁখ কমজোর, দাঁত কমজোর, হলক মে ঘাও হ্যায়, ফেঁফড়া খাবার হ্যায়! ইয়ে সব বোলনে সে হামারি লড়কী কা শাদি ক্যায়সে হোগা? ইয়ে সব বাত রহনে দে, হামারি লড়কী কা ডাক্তারনী সে না দেখায়ে।' ইয়া আল্লাহ! মেয়ের প্রাণ লইয়া টানাটানি, অথচ শাদির চিন্তায় মায়ের চোখে ঘুম ধরে নাই! মূলকথা, অশিক্ষিতা মাতার নিকট ইহাপেক্ষা আর কি আশা করা যাইতে পারে?

কন্যা বয়সটিকে অনেক অভিভাবকই বিয়ের প্রস্তুতিপর্ব বলে ভাবেন। নারীর সৌন্দর্য বর্ধনের চেষ্টাকে রোকেয়া নিন্দনীয় মনে করেছেন– 'যদি অলঙ্কারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্য বর্ধনের উপায় মনে করা হয় তাহাই কি কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্য বর্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্বলতা নহে'?

রোকেয়া কিন্তু তাই বলে মাতৃত্বকে অস্বীকার করেননি বরং বলেছেন, নারীদের মাতৃত্বের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তিনি বলেছেন– 'মায়ের কর্তব্য না-শিখে কেউ যেন মা না হয়'। মেয়েরা শারীরিক শ্রমে অপারগ হয়ে পরের উপার্জিত ধন ভোগে বাধ্য হওয়াকে রোকেয়া যেমন নিন্দা করেছেন, তেমনই বাবার কষ্টার্জিত টাকায় নূপুর পায়ে দেওয়াকে ঘৃণা করেছেন। আবার বিবাহ যে নারী জীবনকে কতটা ধ্বংস করতে পারে এর বিবরণে ভরপুর রোকেয়ার *পদ্মরাগ* উপন্যাস। রোকেয়া সৃষ্ট এক নারী হেলেন হরেস তাই বলেছেন যে, বিবাহ তার কাছে আনন্দের বিষয় নয় বরং 'Poor thing'। রোকেয়া তাঁর গৃহ প্রবন্ধে জানিয়েছেন, অধিকাংশ নারীই গৃহসুখ-বঞ্চিতা। 'আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, অধিকাংশ ভারতীয় নারী গৃহসুখে বঞ্চিতা। যাহারা অপরের অধীনে থাকে, অভিভাবকের বাটীকে আপন ভবন মনে করিতে যাহাদের অধিকার নাই, গৃহ তাহাদের নিকট কারাগার তুল্য বোধ হয়। পারিবারিক জীবনে যে সুখী নহে, যে নিজেকে পরিবারের একজন সভ্য (member) বলিয়া মনে করিতে সাহসী নহে তাহার নিকট গৃহ শান্তিনিকেতন বোধ হইবে না'। তাই দেখা যায়, অর্থ যার আইন তার জন্যই। 'গৃহ' প্রবন্ধে রোকেয়া লিখেছেন– 'টাকা যার, ক্ষমতা যার, আইন তাহারই। আইন আমাদের ন্যায় নিরক্ষর অবলাদের জন্য নহে'। চিন্তা করে দেখুন, বাবা-মার কাছে মেয়ে পরের ধন। যাকে পরহস্ত করার তাগিদে রাতে মায়ের ঘুম হয় না, বিয়ের পর বাড়িতে যে অতিথি মাত্র। আবার স্বামীগৃহে গায়েগতরে খাটতে পারলেই তার মূল্য, তাকে স্বামী যদি 'বেরিয়ে যাও' বলেন বা বলেন যে, এই সম্পর্কটা রাখতে তিনি ইচ্ছুক নন, তখনই তো তার সংসার ভেঙে গেল। তারপর সে কোথায় দাঁড়াবে, গাছতলায়? নাকি ভাইয়ের সংসারে গলগ্রহ হয়ে? পুরুষজাতির তো স্ত্রী মরলেই সৌভাগ্যচন্দ্র উদয় হয়– আবার নতুন জীবনের স্বাদ পান তিনি। রোকেয়া লিখেছেন– 'স্বামী একটুতেই স্ত্রীকে বলে দেন, আয়েন তালাক, বায়েন তালাক। তালাক তালাক, তিন তালাক। আজ জরুরে দিলাম তালাক'। স্বামী বিকালে বন্ধুবান্ধব নিয়ে খুশিতে বেড়াতে যান আর স্ত্রী হাতের চুড়ি ভেঙে কান্নায় ভেঙে বাপের বাড়ি যান। নারীর এই তো নিয়তি! এজন্যই তো কন্যার দুঃসহ পরিসর দেখে বাপ-মাকে দুঃখ করে বলেন–

> 'মেয়ে, মেয়ে মেয়ে তুষ করলে খেয়ে
> হরিভক্তি উড়ে গেল মেয়ের পানে চেয়ে'।

নারী পিতার ঘর, ভাইয়ের ঘর, স্বামীর ঘর ও পুত্রের ঘরে বসবাস করে। তার নিজস্ব ঘরবাড়ি নেই। রোকেয়া নারীদের অবরুদ্ধ অবস্থার দিকে তাকিয়ে দুঃখিত চিত্তে জানিয়েছেন–

> 'গৃহহারা বন্দিনী, লাঞ্ছিতা জাগো!
> বাংলার ভগিনী বাংলার মাগো'।

রোকেয়া নিজেদের অবস্থার জন্য ভাইদের দোষী করেননি, ভ্রাতৃসমাজের মুখে মসি লেপন রোকেয়ার উদ্দেশ্য নয় তা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন। 'গৃহ' প্রবন্ধে তিনি এমনই উক্তি করেছেন– 'আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ভ্রাতা-ভগ্নীগণ হয়ত মনে করিবেন যে, আমি কেবল ভ্রাতৃবৃন্দকে নরাকারে পিশাচরূপে অঙ্কিত করিবার জন্যই কলম ধরিয়াছি। তাহা নয়। আমি ত কোথাও ভ্রাতাদের প্রতি কটু শব্দ ব্যবহার করি নাই–কাহাকেও পাপিষ্ঠ, পিশাচ, নিষ্ঠুর বলিয়াছি কি? কেবল রমণী হৃদয়ের ক্ষত দেখাইয়াছি। ঐ যে কথায় বলে, 'বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়', এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে–ভগ্নীর দুঃখ বর্ণনা করিতে ভ্রাতৃনিন্দা হইয়া পড়িয়াছে'। রোকেয়া জানিয়েছেন যে, পুরুষেরা নারীকে অনুকম্পা করতে করতে আর দয়া দেখাতে গিয়ে দুর্বল বানিয়ে ফেলে। পরবর্তীতে তারা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

আচ্ছা নারীর এই অবস্থার কি বদল আসছে? কেউ বলছেন–'বদল ঘটে গেছে। বদলের মূলে কী রয়েছে? পশ্চিমা নারীবাদ? বই থেকে পাওয়া? নাকি জীবন থেকেই প্রতিবাদের পাঠ নিচ্ছিল মেয়েরা'? নারীর অধস্তনতার মুক্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন রোকেয়া। রোকেয়া পরনিন্দুক নারীদের প্রতি সমর্থন জানাননি, চেয়েছেন নারী হয়ে উঠবে সবলা। 'অবলাদেরও চক্ষুকর্ণ আছে, চিন্তাশক্তি আছে, উক্ত শক্তিগুলোর অনুশীলন যথানিয়মে হওয়া উচিত। তাহাদের বাক্‌শক্তি কেবল আমাদের শিখানো বুলি উচ্চারণ করিবার জন্য নহে'। রোকেয়া নারীর জন্য দুঃখও করেছেন অশ্রুবিরল চিত্তে– 'বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা জানেন? তারা নারী। জীবগুলোর জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই'।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

বিজয় দিবসের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি কথা দুটি একই সূত্রে গাঁথা। সহজ ভাষায় এর অর্থ হলো চাওয়া-পাওয়া। নিজ দেশকে স্বাধীনভাবে বিজয় করতে বাঙালিরা কী চেয়েছে– কী পেয়েছে এটাই হলো মূল বিষয়। প্রথমে প্রত্যাশার কথা দিয়েই শুরু করি। প্রত্যাশা অর্থ চাওয়া বা আশা করা, কামনা করা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি বাঙালি জনতার একটিই প্রত্যাশা ছিল, একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, একটি স্বাধীন মানচিত্র ও একটি স্বাধীনতার পতাকা। বাংলাদেশের বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা এমনিতেই আসেনি। ৩০ লাখ বাঙালির রক্তের বিনিময়ে এবং অনেকের ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ভারতের উত্তর-পূর্ব মুসলিম প্রভাবিত অঞ্চলগুলো নিয়ে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হয়। সেই পাকিস্তান দেশটির জন্য যে লাহোর প্রস্তাব ছিল, সেখানে বহুবচনে দুটি দেশের কথা বলা হয়েছিল। একটি পশ্চিম পাকিস্তান ও অপরটি পূর্ব পাকিস্তান। 'মুদ্রণ প্রমাদ' বলে দুইটি দেশের ধারণাটিকে সরিয়ে একটি পাকিস্তান তৈরি করা হয়েছিল। এই প্রজন্ম চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করে, এটা কীভাবে সম্ভব হয়েছিল? একটি দেশের দুই টুকরো দুই জায়গায়। মাঝখানে হাজার কিলোমিটারের দূরত্ব। আর সেটাই ছিল আজব স্থান পাকিস্তান! পূর্ব বাংলার লোকসংখ্যা ছিল বেশি, অথচ সম্পদের বড়ো অংশ ভোগ করত পশ্চিম পাকিস্তান। পুরো দেশটিই যে ছিল ষড়যন্ত্রের জোড়াতালি দিয়ে তৈরি করা একটি দেশ, সেটা বুঝতে বাঙালিদের মাত্র বছরখানিক সময় লেগেছিল। কল্পিত পাকিস্তানে যে স্বপ্নের স্বাদ বাঙালিরা দেখতে চেয়েছিল, তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল পাকিস্তানের পরিচালকগণ নিজেরাই। কেন্দ্রে বাঙালিদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব, অর্থনৈতিক বিষয়ে তাদের পশ্চাৎপদতার জন্য কেন্দ্রের উদাসীনতা এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন কারণে বাঙালিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বাঙালিদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাতের দরুন তারা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক: স্বাধীনতা স্তম্ভ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

বাঙালিদের কাছে সবচাইতে দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াল এই যে, ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিজে ঢাকায় বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার পূর্বে ঘোষণা করেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। তার উত্তরে ঘটনাস্থলেই দুজন ছাত্র বলেছিলেন, 'না না না'। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই বাঙালিদের মনে পাকিস্তানি শাসকদের সম্পর্কে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। ১৯৫২ সালে এটা চরম আকার ধারণ করে। পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। বাঙালিদের দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ক্ষেপে উঠে মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রফিক, শফিউল, বরকত, সালাম ও জব্বার-এর মতো অনেক বাঙালি এতে শহিদ হন। রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হলো। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের যুক্তফ্রন্টই বিপুল ভোটে জয়ী হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করল। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর প্রতি এটাও ছিল বাঙালিদের ঘৃণার আরেক দফা বহিঃপ্রকাশ। বছর না ঘোরার আগেই সে সরকারকে বাতিল করে দেওয়া হলো। ১৯৫৮ সালে আইয়ুবের নেতৃত্বে সামরিক জান্তা পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করেন। তার আমলে অর্থনৈতিক বিষয়ে বাঙালিদের ভাগ্যের উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তখন আইয়ুবের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও গণ-আন্দোলন শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু তখন একজন তরুণ রাজনৈতিক নেতা। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে, পাকিস্তানের এ ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি লাভের একটি মাত্র উপায়; সেটি হচ্ছে স্বায়ত্তশাসন। তিনি ৬ দফা আন্দোলন শুরু করেন। একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে, ৬ দফায় আসলে একটি মাত্র দফা, যার আসল অর্থ হলো স্বাধীনতা!

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীরা বেশিরভাগ সময়ই জেলখানায় থাকেন। রাজনৈতিক বড়ো নেতাদের বলতে গেলে কেউই তখন বাইরে নেই। ছাত্ররাই আন্দোলন করে বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে বের করে আনেন। এ প্রজন্মের ছাত্র-রাজনীতিবিদরা হয়ত কল্পনা করতে পারবে না যে, তাদের পূর্বসূরিরা অর্থাৎ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্র কর্মীরা একসময় এত বড়ো কাজ করেছে! ১৯৬৯ সালের বিশাল গণ-আন্দোলনে আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করে পদত্যাগ করেন। নৃশংস ঘাতক জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতায় এসেই ঘোষণা করেন যে, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে খুব শীঘ্রই ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। ১৯৭০ সালের ৭ই ও ১৭ই ডিসেম্বর যথাক্রমে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার প্রতি স্বীকৃতি জানিয়ে বাঙালিদের ভোটে সমগ্র পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বাঙালিরা প্রথমবার এদেশের শাসনভার গ্রহণ করবে এতে পাকিস্তানি মিলিটারিদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল! ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল ঘোষণা করেন। এতে পূর্ব বাংলায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধু তখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে অংশ নেয়। এর মাঝে বাংলার জনগণ সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে 'স্বাধীন বাংলা' স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে। এবং পশ্চিমা

শাসকগোষ্ঠীর ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে জোর দাবি উত্থাপন করতে থাকে। এ সময় বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক জনসভার ডাক দেন। সেই বিশাল জনসভার মাঝে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণটি দিলেন, যেটি শুনলে এখনো এ প্রজন্মের মানুষের শরীরে ও মনে শিহরণ জাগে! আজও সেই ভাষণটি সবাই মন দিয়ে শুনতে চায়! বজ্রকণ্ঠে তাঁর আওয়াজ, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এই সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তিনি দেশের আপামর জনগণকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে নির্দেশ দেন।

২৫শে মার্চ গভীর রাতে অতর্কিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এক বর্বর গণহত্যা চালায় বাঙালিদের ওপর। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু কারারুদ্ধ হবার পূর্বক্ষণে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ জারি করেন এবং বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে

মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার

ঘোষণা করেন। সেই থেকে শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ! দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস হচ্ছে ৩০ লাখ বাঙালি জনতার আত্মত্যাগের ইতিহাস, বাঙালি জনতার বীরত্বের ইতিহাস আর অর্জনের ইতিহাস। পৃথিবীর কয়টি দেশ এরূপ একটি গৌরবের ইতিহাস দাবি করতে পারবে? তাই বলব, বাঙালির বিজয়ের প্রত্যাশা সফল হয়েছে। এবার প্রাপ্তি নিয়ে বলি। প্রাপ্তি হচ্ছে পাওয়া, লাভ, আয়, উপার্জন। সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি হচ্ছে একটি স্বাধীন দেশ, একটি স্বাধীন পতাকা ও একটি স্বাধীন মানচিত্র পাওয়া। কিন্তু দেশ স্বাধীনের বছর তিনেক পরই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করে ঘাতক দালাল চক্র। যাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার মানুষ দেশ স্বাধীন করল, তাঁর নাম এদেশ থেকে মুছে ফেলতেই এ জঘন্যতম হীন চক্রান্ত। পাকিস্তানের দোসর আলবদর, আলশামস এবং রাজাকার চক্রই এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। তারপর থেকে ২০টি বছর এদেশের জনগণ একেবারে পাকিস্তানের দোসরদের অধীনেই চলে গিয়েছিল। কী আশ্চর্য, মুক্তিযুদ্ধের যে স্লোগানটি সকলকে স্বাধীনতার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল, সে স্লোগানটিই এদেশে নির্বাসিত হয়েছিল! দেশের শাসক হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত স্বাধীনতার শত্রুরা। 'জয় বাংলা' স্লোগানটি আওয়ামী লীগ কর্মীদের মাঝে কোনোমতে বেঁচেছিল! এই স্লোগানটি উচ্চারণ করলেই গ্রেফতার করা হতো, ভাবা হতো নিশ্চয়ই সে আওয়ামী লীগের কর্মী!

বাংলাদেশের একটি কালো অধ্যায়ের সময় ছিল সেই বছরগুলো। সেই সময় স্বাধীনতার ইতিহাসকে অস্বীকার করা হতো বা ছোটো করে দেখা হতো। রাজাকার শব্দটি উচ্চারণ করা যেত না; পাকিস্তানি হানাদার নয়, শুধু হানাদার বলতে হতো। মুক্তিযুদ্ধের কথা বললে তাদের শাসন করা হতো, শাস্তি হিসেবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলি করা হতো, তখন স্বাধীনতার বিপক্ষে যারা ছিল, মুক্তিযোদ্ধাদের যারা হত্যা করেছে, সেই রাজাকাররা এমপি, মন্ত্রী হলো, তারা গাড়িতে জাতীয় পতাকা লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতো– স্বাধীনতাকামী বাঙালিরা এ দৃশ্য দেখে ঘৃণায় সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিত। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা স্বাধীন বাংলার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন বাঙালিরা আবার আশার আলো দেখেন। এটা বড়ো সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল। সেই দুঃসময় পেছনে ফেলে বঙ্গবন্ধু কন্যা এগিয়ে চলেছেন স্বাধীন দেশকে নতুন করে বিনির্মাণ করার লক্ষ্যে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, সবচেয়ে বড়ো প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। স্বাধীন দেশের কিছু প্রাপ্তি সব জনগণের মাঝেই থাকতে পারে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেই প্রাপ্তি পূরণ করে চলেছেন। ১. পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ ২. সমুদ্রসীমা জয় ৩. শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি, ৪. ফ্লাইওভার নির্মাণ, ৫. জেলেদের সাময়িক ইলিশ ধরা থেকে বিরত রাখার পাশাপাশি তাদের খাদ্য সহায়তা প্রদান ৬. বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা এবং প্রতিবন্ধীভাতার প্রচলন। এ উদ্যোগের জন্য এখন দরিদ্রতার হার প্রায় নিম্ন পর্যায়ে চলে এসেছে ৭. যুদ্ধাপরাধী ও রাজাকারদের বিচার ৮. বছরের প্রথম দিনে এক কোটি শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে বই বিতরণ কর্মসূচি ৯. মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি ১০. কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরি ১১. দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ১২. জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ১৩. গরিব শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদান ১৪. বিভিন্ন জেলার অন্তত একটি করে হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ১৫. মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ৫০০ থেকে ১০০০০ টাকায় বৃদ্ধি ১৬. প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল তথ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন ১৭. বিভিন্ন জেলায় বিনোদন কেন্দ্র ও শিল্পপার্ক নির্মাণ ১৮. দেশের বিভিন্ন স্থানে ইকোনমিক জোন নির্মাণ ১৯. রাস্তাঘাট ও কালভার্ট নির্মাণ ২০. ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণ ২১. একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প গ্রহণ ২২. কৃষিতে সফলতা অর্জন ২৩. জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমন ২৪. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারকার্য সম্পন্ন ২৫. নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ২৬. এশিয়ান হাইওয়ে রোড প্রকল্প গ্রহণ ২৭. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি ২৮. প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে বর্তমানে বাঙালির সবচাইতে বড়ো প্রাপ্তি হচ্ছে, বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের পরিচয় ছেড়ে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় ওঠার যোগ্যতা অর্জন। এই সাফল্যের স্বীকৃতি দেশ ও মানুষের মর্যাদা সমুন্নত করেছে বিশ্ব দরবারে। শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই বাঙালির এই প্রাপ্তি।

আমাদের বিজয় দিবসের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে দেশ স্বাধীনতার মাধ্যমে, স্বাধীনতার ৪৮তম বিজয় দিবসে প্রাপ্তি পূরণ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের চাওয়া বিজয়ের এই প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিটুকু যেন হারিয়ে না ফেলি।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

মরমি শিল্পী মমতাজ আলী খান

মিয়াজান কবীর

আমার মায়ের মামা মমতাজ আলী খান। তিনি পিআইএ (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স)-তে চাকরি নিয়ে সপরিবার করাচিতে ছিলেন। মায়ের মুখে আমার নানা মমতাজ আলী খানের অনেক গল্প শুনতাম। গল্প শুনতে শুনতে মমতাজ আলী খান আমার কাছে রূপকথার এক রাজপুত্র হয়ে উঠেছিলেন।

গ্রামবাংলায় চৈত্রসংক্রান্তিতে গরুর দাবাড় এবং মেলা উৎসবে পরিণত হতো। আমাদের গ্রামে পাণ্ডুইভিটায়ও নানান খেলনাপাতি নিয়ে মেলা বসত। আমি মায়ের আঁচল থেকে পয়সা নিয়ে মেলায় গিয়ে বাঁশের বাঁশি কিনতাম। সেসব বাঁশির বিচিত্র নাম ছিল। নলবাঁশি, পাতাবাঁশি, আড়বাঁশি কিনে ফুঁ দিতে দিতে খেলার সাথিদের নিয়ে বাড়ি ফিরতাম।

আমাদের বাড়িটি ছিল ধলেশ্বরী তটরেখায়। ছনের ছাউনি বাংলা ঘরে বসে প্যাঁ-পু-প্যাঁ বাঁশিতে সুর তুলতাম। আমার বাঁশির সুর শুনে মা হাসতেন আর বলতেন, 'তুই আমার মামার মতো শিল্পী হতে চাস নাকি'! আমি এ কথার উত্তর না দিয়ে মনে মনে পুলকিত হতাম। কেননা, মমতাজ আলী খানের মতো শিল্পী হওয়া সেতো ভাগ্যের ব্যাপার। দিনের বেলায় বাঁশি বাজালে মায়ের কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু রাতে যখন বাঁশিতে সুর তুলতাম মা তখন বারণ করতেন। কখনো শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, কখনো সাপের ভয় দেখিয়ে। তাঁর এসব কথা শুনে ভয় হতো ঠিকই কিন্তু সুরের মায়াজালে সবকিছু ভুলে গিয়ে আবার বাঁশিতে সুর তুলতাম। আমাকে ভয় দেখানোর পরও যখন রাতে বাঁশি বাজাতাম, তখন মা বললেন– 'তোর নানা বাঁশি বাজানোর কারণে তার সবকটি দাঁত পড়ে গেছে'। তখনও আমি মমতাজ আলী খানকে দেখিনি। আমি বালক মনে ভাবতে লাগলাম– সত্যি যদি বাঁশি বাজালে দাঁত পড়ে যায় তাহলে ভাত খাব কীভাবে। লোকের সামনে যেতেও লজ্জা পাব। বালক বয়সে এসব এলোমেলো ভাবনাগুলোর কোনো উত্তর খুঁজে পাইনি। মায়ের কানে যাতে আমার বাঁশির সুর না যায় সেদিকে খেয়াল রেখে জোৎস্নাভরা রাতে ধলেশ্বরীর বুকে নাও ভাসিয়ে ভাটির পানে বহুদূরে চলে যেতাম। তারপর বাঁশিতে সুর তুলতাম। সুর মানেই প্যাঁ-পু-প্যাঁ।

১৯৭১ সাল। ২৫শে মার্চ। কালরাত্রে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ঢাকা শহর আক্রমণ করে। নানাভাই মার্চের প্রথম দিকে ছুটিতে করাচি থেকে ঢাকায় এসেছিলেন। এরপর তিনি পরিবারসহ গ্রামের বাড়ি ইরতায় চলে আসেন। তখন তাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়। নানা হিসেবে তার সঙ্গে আমার ভাব জমে উঠে। গ্রামে এসে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একতারা হাতে গান পরিবেশন করতে থাকেন। সঙ্গে ছিলেন তার দুই কন্যা দীপু মমতাজ আর পিলু মমতাজ। আমিও গানের আসরে উপস্থিত হয়ে তার গান শুনতাম। নানাভাইয়ের গান শুনে আন্দোলিত হয়ে আমিও লিখলাম মুক্তিযুদ্ধের গান।

আমাদের গ্রামের লোককবি শামসুদ্দিন আহমেদও বেশকিছু মুক্তিযুদ্ধের গান লিখেন। তার গানের কথা ও সুর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। শামসুদ্দিন আহমেদ-এর লেখা মুক্তিযুদ্ধের গান ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শাখাওয়াত হোসেনের টেপরেকর্ডে রেকর্ড করা হয়। আমাদের দুজনের ইচ্ছে– আমাদের লেখা গানগুলোর রেকর্ড শাখাওয়াত হোসেনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে পাঠাবো। শাখাওয়াত হোসেন গ্রামের ছেলেদের নিয়ে একদিন রাতের আঁধারে ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করেন। সেখানে গিয়ে নবগঠিত বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরপর দেশের পরিস্থিতি দিন

মমতাজ আলী খান (১৯২০-১৯৯০)

দিন সংকটাপন্ন হয়ে পড়লে আমাদের গান পাঠানো আর সম্ভব হয়নি।

একাত্তরে আমাদের গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। একথা জানতে পেরে পাকবাহিনী আমাদের গ্রাম আক্রমণ করার জন্য নীল নকশা তৈরি করে। একথা জানাজানি হলে গ্রামের মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। তখন মমতাজ আলী খান গ্রামে থাকা নিরাপদ না মনে করে সপরিবার দোহার লস্করকান্দি তার শ্বশুরবাড়ি চলে যান।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি ঢাকায় মমতাজ আলী খানের বাসায় যাতায়াত করতাম। আমি লেখালেখি করি এজন্য তিনি আমাকে খুব আদর করতেন। আমার লেখা গান-কবিতা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমাকে লিখতে উৎসাহিত করতেন। তিনি রিকশা করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে যেতেন। সারা পথ চলতে চলতে তার জীবনের নানা কথা-কাহিনি আমাকে বলতেন। আমি একজন শ্রোতা হিসেবে বিমুগ্ধ হয়ে তার ফেলে আসা অতীত দিনের কথা শুনতাম। তিনি বলতেন– 'আমি অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে রিকশায় না এসে হেঁটে হেঁটে রওনা দিতাম। রমনা পার্কে কিছুক্ষণ বসতাম। পার্কে একাকী বসে নীরবে-নির্জনে সবুজ-শ্যামল নিসর্গ দেখতাম। তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে হাতিরপুলের বাসায় ফিরতাম। বাসায় ফিরে এসে একেকদিন কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে চাদর মুড়ে শুয়ে পড়তাম। সবাই ভাবত আমি ঘুমিয়ে গেছি। আসলে আমি গানের ছন্দ-সুরের আকুলতায় ডুবে থাকতাম। ফুলের মাঝে প্রজাপতির গুঞ্জরণ দেখে আমার মন ভরে যেত। আমার এই ভালো লাগা দৃশ্যপটগুলো গানের ভাষায় রূপায়িত করেছি। এমনিভাবে গল্পচ্ছলে নানাভাই তার বর্ণাঢ্য জীবনের নানা রঙের কথা বলে যেতেন।

নানাভাই ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক। সেইসাথে ছিলেন আবেগ প্রবণ একজন মানুষ। তার লেখায়, গানে তার মনের আকুলতা ফুটে উঠেছে। নানাভাইয়ের লেখা গানের মরমিয়া সুর আমার হৃদয়ে আলোড়িত করে তুলত। 'বন্ধুরে তুমি বৈদেশি নাগর'– এই গানটি দেশের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী মাহবুবা রহমানের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে নানাভাই গেয়েছেন। আমি নানাভাইকে বললাম: নানাভাই, এই গানটি কখন, কীভাবে লিখেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার পিআইএ-তে চাকরি হয়। তখন আমাকে করাচি পোস্টিং দিয়ে বলা হলো যে, ছয়

মাসের আগে ছুটি পাবার সম্ভাবনা নেই। তখন আমি আমার মনের আকুতি গানের ভাষায় লিখে সুর করে রেকর্ড করি। তারপর করাচি চলে যাই। এই গানটি দেশের নন্দিত পরিচালক খান আতাউর রহমান তাঁর 'সাত ভাই চম্পা' চলচ্চিত্রে সংযোজন করেছিলেন। এই গানের কথা-সুর এখনো মানুষের মনে দোলা দিয়ে যায়।

নানাভাই ছিলেন মিষ্টভাষী। আমাকে কাছে পেলে তার জীবনের নানান কথা বলতেন। তিনি কীভাবে বেড়ে উঠেছেন, কীভাবে গানের মায়াজালে জড়িয়ে পড়েছেন, এসব কথা মাঝে মাঝে বলতেন। ধলেশ্বরী নদীর ভাটির স্রোতে নাও ভাসিয়ে আপন মনে গানের সুর তুলতেন। আবার উজান ঠেলে বাড়ি ফিরতেন। কখনো ধলেশ্বরী নদীর জলে গলা পানিতে দাঁড়িয়ে গান গাইতেন। এতে নাকি কণ্ঠের মিষ্টতা বাড়ে। একথা মনে করে তিনি শৈশবে দীর্ঘদিন এমনিভাবে সুরের সাধনা করেছেন।

গ্রামের রাখাল বালকদের কাছে শুনতেন বারোমাসী গান। জ্যোৎস্না রাতে বাড়ির উঠানে বসে শুনতেন কিচ্ছা-কাহিনি। গ্রামবাংলার গল্পকথার মাঝে মাঝে কথক আবেদ আলী আর ছাবেদ আলীর গানের সুরের ব্যঞ্জনায় আকুল হয়ে উঠতেন মমতাজ আলী খান।

মমতাজ আলী খান শৈশব থেকে গানের সুরে বিমোহিত হয়েছিলেন। তিনি দিগন্ত আকাশের নিচে বিস্তৃত মাঠে মুক্তকণ্ঠে গান গেয়ে বেড়াতেন। বিস্তীর্ণ বিল-বাঁওড়ে কিংবা ধলেশ্বরীতে মাছ ধরতে গিয়েও সুর ধরে গান গাইতেন। নদীর বুকে পাল তুলে মাঝিরা যখন ভাটিয়ালি গান গেয়ে যেত তখন তিনি নিবিড় চিত্তে আপন মনে গান শুনতেন। সেই গানের কথা ও সুর তার মনের মাঝে দোলা দিয়ে যেত। গানের সুরের আকুলতায় ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। কখনো গ্রামের দখিন পাশে বশিরউদ্দিন মিস্ত্রির কাছে ছুটে যেতেন। কখনো চলে যেতেন মরমি কবি আছালত মুন্সীর কাছে। আবার কখনো যাযাবর বেদে সুন্দর আলীর নৌকায়। এদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতেন গানের কথা আর সুর।

গানের সুরের টানে আকুলিবিকুলি হয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াতেন গ্রাম-গ্রামান্তরে। বন্ধু গোলাম আম্বিয়া, গোলাম কিবরিয়া আর বাদশা মিয়া মিলে ধরেশ্বরীর পাড়ে বসে গান গাইতেন। গ্রামের মুরুব্বিদের চোখে বেমানান হয়ে ওঠেন। সমালোচনার ঝড় বইতে থাকে। মেজো ভাই আব্দুল মজিদ খান কলকাতা থেকে ছুটিতে বাড়িতে এসে একথা শুনতে পান। তাই তিনি সঙ্গে করে মমতাজ আলী খানকে কলকাতায় নিয়ে যান। তার মনের মাঝে সুরের আকুলতা তোলপাড় করে তোলে। অন্য কোনো কাজ তাই তার ভালো লাগে না। কলকাতায় গিয়েও তিনি রাতে গড়ের মাঠে বসে উদাস মনে গান গাইতেন। কোনো একদিন কবি জসীমউদদীন গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে পথ চলতে শুনতে পেলেন মমতাজ আলী খানের সুরেলা কণ্ঠের গান। কবি জসীমউদদীন মমতাজ আলী খানের কণ্ঠে গান শুনে মুগ্ধ হলেন। জসীমউদদীন ছিলেন 'সং পাবলিসিটি' বিভাগের একজন কর্মকর্তা। কবি জসীমউদদীনের সহযোগিতায় মমতাজ আলী খান 'সং পাবলিসিটি'তে যোগদান করেন। 'সং পাবলিসিটি'র কমসূচি ছিল পরিবেশ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। গানের মাধ্যমে সুরে সুরে মানুষকে জাগিয়ে তোলা। মমতাজ আলী খান ছেলেবেলায় নিজ গ্রামের অনতিদূরে রৌহাটেক গ্রামের সাহেব আলীর কাছে শিখেছিলেন দোতারা বাজানো।

মমতাজ আলী খানের আশৈশব স্বপ্ন ছিল একজন শিল্পী হওয়ার। এই চিন্তার আতিশয্যে তিনি গানের তালিম নিতে থাকেন ওস্তাদ নেসারউদদীন ও ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কাছে। তিনি সুযোগ্য ওস্তাদের কাছে গানের তালিম পেয়ে দিনে দিনে ঋদ্ধ হয়ে উঠেন। ১৯৪২ সালে 'অল ইন্ডিয়া' রেডিও'তে– 'ওরে শ্যাম কেলে সোনা' এবং 'আমি যমুনাতে যাই বন্ধু'– এই দুটি গান পরিবেশন করে সুধী মহলে প্রশংসিত হন। এরপর থেকে তার শুরু হয় নতুন পথচলা। কিছুদিন পর 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' থেকে তার গানের রেকর্ড বের হয়। 'বন্ধু আমার সওদাগর, নদীর কূলে বানছে ঘররে', 'চাকরিতে প্রাণনাথ যাইও নারে'– তার কণ্ঠে এসব গান জনমনে তোলপাড় সৃষ্টি করে। 'গোল্ডেন ভয়েস' শিল্পী হিসেবে অল্প সময়ের মধ্যে খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হন। একজন কণ্ঠশিল্পী হিসেবে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে মমতাজ আলী খানের সুনাম।

মমতাজ আলী খান শুধু কণ্ঠশিল্পী হিসেবে নয়, একজন অভিনেতা হিসেবেও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তিনি *অভিযাত্রী* চলচ্চিত্রে একজন শিল্পীর ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শক মহলে নন্দিত হয়েছেন।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর মমতাজ আলী খান তার জন্মভূমি বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) চলে আসতে চাইলে ভারত সরকার তাকে কলকাতায় থাকার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু মাটির টানে মমতাজ আলী খান ফিরে আসেন তার জন্মভূমিতে। স্বদেশে ফিরে এসে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে এবং টেলিভিশনে সংগীত পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করেন।

এছাড়াও তিনি অনেক চলচ্চিত্রে কণ্ঠ দিয়েছেন এবং সংগীত পরিচালনা করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তারমধ্যে *মধুচন্দ্রিমা*, *অশ্রু দিশারী*, *কলঙ্ক*, *আকাশ আর মাটি*, *সাতভাই চম্পা*, *বেদের মেয়ে*, *অরুণ-বরুণ কিরণমালা*, *রূপবান*, *জোয়ারভাটা*, *যে নদী মরুপথে*, *ভাওয়াল সন্ন্যাসী*, *দয়াল মুর্শিদ*, *অনেকদিন আগে*, *একমুঠো ভাত*, *লালন ফকির*, *নিমাই সন্ন্যাসী* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও *দয়াল মুর্শিদ* চলচ্চিত্রে মাঝির ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন।

তার শিল্পী জীবনে রয়েছে বহুমাত্রিকতা। মমতাজ আলী খান ছিলেন একাধারে শিল্পী-গীতিকার-সুরকার-সংগ্রাহক-অভিনেতা এবং সংগীত পরিচালক। গ্রামবাংলা থেকে অনেক গান সংগ্রহ করেছেন তিনি। শিল্পী জীবনে গ্রামবাংলার সেইসব গানের সুর প্রতিফলন ঘটেছিল তার সংগীতে।

মমতাজ আলী খান ছিলেন সুরের জাদুকর। তিনি লালন ফকিরের 'কে কথা কয়রে দেখা দেয় না', 'বাড়ির কাছে আরশিনগর, তোরা দেখবি যদি আয়, সোনার মানুষ বিরাজ করে খাকের পিঞ্জিরায়' এসব গানে সুরারোপ করে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ইথারে ইথারে।

এছাড়াও সাধক কবি কালুশাহ, হর্ষনাথ গাঙ্গুলি– এমনি আরো অনেক মরমি কবির গান গেয়ে আবহমান বাংলার লোকসংগীতের বাণী ও সুর সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি হয়েছেন নন্দিত।

মমতাজ আলী খান সংগীত জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ১৯৬২ সালে 'সাউথ-ইস্ট এশিয়ান মিউজিক কনটেস্ট'-এ প্রথম স্থান এবং ১৯৮০ সালে সংগীতে অবদানের জন্য 'একুশে পদক' লাভ করেন।

মমতাজ আলী খান ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার ইরতা কাশিমপুর গ্রামে। তার বাবার নাম আফসার আলী খান, মায়ের নাম বেদৌরা খানম। বাবা মায়ের চার ছেলের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান। এই মরমি শিল্পী তার কর্মমুখর জীবনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৯০ সালের ৩১শে আগস্ট এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চিরবিদায় নিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন।

কালের স্রোতে হারিয়ে যায় জীবনকাহিনি। কিন্তু মানুষ তার কর্ম-কীর্তিতে বেঁচে থাকে যুগ-যুগান্তর। মমতাজ আলী খানের গান-সুর আমাদের হৃদয়ে এখনো তুলে সুরের ঝংকার। সে গান, সে সুর চির অম্লান, চির প্রবহমান। তিনি তার কর্ম-কীর্তিতে চির অমর, চির ভাস্বর।

লেখক: সাহিত্যিক ও গবেষক

বিজয় দিবসের মহিমা

সোহরাব আহমেদ

আমাদের জাতীয় জীবনে ১৬ই ডিসেম্বর সবচেয়ে আনন্দ ও গৌরবের একটি দিন। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এই দিনে আমাদের প্রিয় স্বদেশ দখলদার মুক্ত হয়েছিল। লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ লাভ করেছিলাম। এই দিনটি তাই আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। এটি আমাদের বিজয় দিবস।

বিজয় মহান, কিন্তু বিজয়ের জন্য সংগ্রাম মহত্তর। প্রতিটি বিজয়ের জন্য কঠোর সংগ্রাম প্রয়োজন। আমাদের বিজয় দিবসের মহান অর্জনের পেছনেও বীর বাঙালির সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মদানের ইতিহাস রয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় প্রথম থেকেই বাঙালিদের মনে পশ্চিমা শোষণ থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছার জাগরণ ঘটে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নানা আন্দোলনের মাধ্যমে তা প্রবল আকার ধারণ করতে থাকে। অবশেষে বাঙালির স্বাধিকার চেতনা ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে। বাঙালির স্বাধিকারের ন্যায্য দাবিকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পশ্চিমা সামরিক জান্তা বাঙালি নিধনের নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাঙালিরা রুখে দাঁড়ায়। গর্জে ওঠে। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলে। কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী-সাহিত্যিক, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান- বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সবাইকে নিয়ে গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশ মাতৃকার মুক্তিসংগ্রামে। সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ চলে। পাকিস্তানি সামরিক জল্লাদরা এ সময় গ্রামেগঞ্জে-শহরে-বন্দরে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে নিরীহ জনসাধারণকে। ঘরবাড়ি, দোকানপাট লুট করে জ্বালিয়ে দেয়। মা-বোনদের ওপর পাশবিক নির্যাতন করে। প্রাণ বাঁচাতে সহায়-সম্বলহীন এক কোটি মানুষকে আশ্রয় নিতে হয় প্রতিবেশী দেশ ভারতে। তবু বাঙালি দমে যায়নি। পৃথিবী অবাক তাকিয়ে দেখে, অবাক তাকিয়ে রয়, জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়।

অবশেষে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী পরাজয় স্বীকার করে নেয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এদেশের মুক্তিসেনা ও মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। রক্তাক্ত সংগ্রামের অবসান ঘটে। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। সূচিত হয় বাংলাদেশের মহান বিজয়।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর গৌরবময় বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঙালির জয়যাত্রার শুরু। এই দিনে স্বপরিচয়ে আমরা বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ পাই। এই দিনটির জন্যই সারাবিশ্বে বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের মর্যাদা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রতিবছর সবিশেষ মর্যাদা নিয়ে জাতির কাছে হাজির হয় বিজয় দিবস। সব অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ-দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিজয় দিবস আমাদের মনে প্রেরণা সৃষ্টি করে।

১৬ই ডিসেম্বর ভোরে সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটির শুভ সূচনা হয়। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ মহাসমারোহে বিজয় দিবস পালন করে। ১৫ই ডিসেম্বর রাত থেকেই বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি চলে। দেশের সমস্ত স্কুল-কলেজ, ঘরবাড়ি, দোকানপাট, রিক্সা-গাড়ি ইত্যাদিতে শোভা পায় লাল-সবুজ পতাকা। স্কুল-কলেজ কিংবা রাস্তায় রাস্তায় আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক

বিজয় দিবস উপলক্ষে সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ

অনুষ্ঠানের। স্বাধীনতার আনন্দে সব শ্রেণির মানুষ যোগ দেয় এসব অনুষ্ঠানে। কোথাও কোথাও বসে বিজয় মেলা। সরকারিভাবে এ দিনটি বেশ জাঁকজমকভাবে পালন করা হয়। ঢাকার জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বাংলাদেশ সামরিক ও প্রতিরক্ষাবাহিনীর সদস্যগণ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিরোধীদলীয় নেতা-নেত্রীগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে হাজার হাজার মানুষ এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করেন। বিজয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন কাঙালিভোজের আয়োজন করে। অনেক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিজয় দিবস স্মরণে অনুষ্ঠান করে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিশেষ ক্রোড়পত্র। বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের আত্মার শান্তি ও দেশের কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করা হয়। শহরে সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয় বিশেষ আলোকসজ্জার। সমগ্র দেশজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশে বিজয় দিবস পালিত হয়।

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এই স্বাধীনতা আমাদের অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। এই দিনটি শুধুই আমাদের বিজয়ের দিন নয়, বেদনারও দিন। আমাদের চেতনা জাগরণেরও দিন। যাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে আমরা এই গৌরবের অধিকার পেয়েছি, তাঁদের সেই আত্মোৎসর্গের কথা মনে রেখে আমাদেরও সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দেশ ও জাতিকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবেই বিজয় দিবসের মহিমা অর্থবহ হয়ে উঠবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

গ্রাফিক নভেল মুজিব: জাপানি ভাষায়

ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্থপতি, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীভিত্তিক গ্রাফিক নভেল 'মুজিব' জাপানি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ঢাকা লিট ফেস্টে গ্রাফিক নভেল *মুজিব*-এর ইংরেজি সংস্করণের মোড়ক উন্মোচনের পর ২৬শে নভেম্বর ২০১৮ জাপানের টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে জাঁকজমকপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাপানি ভাষায় অনূদিত বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। বাংলাদেশ দূতাবাস, টোকিওর উদ্যোগে গ্রাফিক নভেল *মুজিব* জাপানি ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনা করেছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)।

টোকিওতে জাপানি ভাষায় অনূদিত গ্রাফিক নভেল 'মুজিব'-এর মোড়ক উন্মোচন

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী মিজ আকিয়ে আবে, জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মিজ তোশিকো আবে, গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা, বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকসহ জাপানে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণ। এছাড়াও জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, জাপানের সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং জাপানে অবস্থানরত বাংলাদেশি প্রবাসীরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সম্মানিত অতিথিদের বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী উত্তরীয় পরিয়ে দেন জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। স্বাগত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মময় জীবনকে জাপানি শিশু-কিশোর ও জাপান প্রবাসী বাংলাদেশি সন্তানদের কাছে তুলে ধরার অভিপ্রায় নিয়ে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, ইংরেজি ছাড়া প্রথম অন্য কোনো বিদেশি ভাষায় গ্রাফিক নভেল *মুজিব* অনুবাদ করা হলো।

প্রধান অতিথি আকিয়ে আবে বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক মহান নেতা। যেহেতু গ্রাফিক নভেল জাপানিদের খুব প্রিয় তাই জাপানি ভাষায় অনূদিত গ্রাফিক নভেল *মুজিব* তাঁর সম্পর্কে জাপানের শিশু-কিশোরদের অবহিত করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তোশিকো আবে বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আশা প্রকাশ করে বলেন, অনূদিত গ্রাফিক নভেল এই মহান নেতার জীবন সম্পর্কে জানতে সবাইকে সহায়তা করবে।

বইটির প্রকাশক রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, গ্রাফিক নভেল *মুজিব* জাপানি ভাষায় অনুবাদ সফলভাবে সমাপ্ত করার জন্য টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাস এবং দুই অনুবাদককে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জীবন-সংগ্রাম নিয়ে রচিত একটি 'টাইম-লাইন' ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। বইটির দু'জন অনুবাদক অধ্যাপক মাসাকি ওহাসি এবং ইমরান শরিফকে ক্রেস্ট দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। এদিন জাপানি ভাষায় প্রকাশিত গ্রাফিক নভেল *মুজিব* টোকিওর সেক্রেড হার্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ করে শোনানো হয়। গ্রাফিক নভেল *মুজিব* গ্রন্থটি পর্যায়ক্রমে জাপানের বিভিন্ন স্কুলে পাঠ্য করা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে বিতরণ করা হবে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়।

উল্লেখ্য, সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* অবলম্বনে প্রকাশ করেছে তাঁর জীবনীভিত্তিক গ্রন্থ গ্রাফিক নভেল *মুজিব*, যা বাংলাদেশে প্রথম কোনো ব্যক্তির জীবনী নিয়ে গ্রাফিক নভেল। শিশু-কিশোরদের কাছে প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে এ গ্রাফিক নভেলটি লেখা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। গ্রাফিক নভেলের প্রকাশক হিসেবে রয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ ও বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক। এতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন সিআরআই-এর এক ঝাঁক তরুণ। ভবিষ্যতে গ্রাফিক নভেলটির অ্যানিমেশনও তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান প্রকাশক।

লেখক: প্রাবন্ধিক

অমর স্বদেশপ্রেমিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ম. মীজানুর রহমান

বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হয়েছিল ব্রিটিশ যুগের শুরু থেকেই। আজ পূর্ব বাংলার যে অংশ আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীনতা লাভ করেছি, সেই বাংলাদেশের সন্তান নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলি চৌধুরী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, বেগম আজিজুন্নেসা, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ স্বদেশপ্রেমী সন্তানেরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বাঙালি জাতির উন্নতির লক্ষ্যে প্রভূত অবদান রেখেছেন। তাঁদের সকলের কথা স্মরণে রেখে তৎকালের (অবিভক্ত বাংলার) প্রখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জীবন ও কর্মের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। আমার যদ্দুর মনে পড়ে তৎকালে তিনিই প্রথম বাঙালি, যিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'বিহার বিহারিদের, পাঞ্জাব পাঞ্জাবিদের, সিন্ধু সিন্ধিদের কিন্তু বাংলাদেশ সবার'। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় ছিলেন কতটা সচেতন।

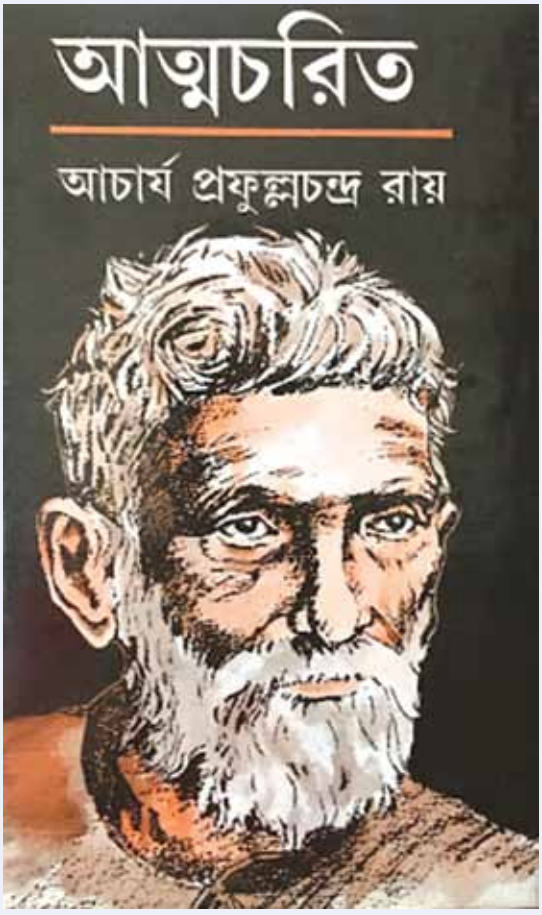

বাংলাদেশের এই মহান সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন খুলনা জেলার পাইকগাছা থানার অন্তর্গত রারুলি গ্রামে ২রা আগস্ট ১৮৬১ সালে। অন্যান্য বিদগ্ধজনের মতো তিনিও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে রয়ে গেছেন অজানা-অচেনা। কিন্তু যখনই আমরা মনে করি ১৮৯২ সালে কলকাতার তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালসের কথা, যাকে তিনি ১৯০১ সালে উন্নীত করেছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেডে তখন আর তাঁকে কিছুতেই ভোলা যায় না পুরোধা বাঙালি জাতীয়তাবাদী মহান বিজ্ঞানী হিসেবে। তৎকালের পশ্চাদপদ বাঙালিদের কথা তিনি ভেবেছিলেন গভীরভাবে। তাই তিনি বাঙালি জাতির গর্বিত সন্তান। প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এক বিত্তশালী হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরিশ চন্দ্র রায় ছিলেন একজন জ্ঞানবান স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর পিতার ছিল বহু ভাষায় পাণ্ডিত্য। শিক্ষা বিস্তারে ছিল যাঁর অগ্রণী ভূমিকা এবং জ্ঞান বিস্তারের লক্ষ্যে যিনি তাঁর গ্রামের বাড়িতে এক বিশাল গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন।

১৮৭০ সাল পর্যন্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁর গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। অতঃপর তাঁকে কলকাতা হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ১৮৭২ সালে তিনি গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং পিতার গ্রন্থাগারে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি কলকাতার অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। এ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রী কেশবচন্দ্র সেন। এই স্কুল থেকে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৮৭৯ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত কলকাতা মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে ১৮৮১ সালে এফ এ পাস করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ব্যাচেলার অব আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর অসামান্য মেধার পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে লন্ডনে পড়ার জন্য গিলক্রাইস্ট পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৮৮৪ সালে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৮৮৫ সালে তাঁর 'এসেস অব ইন্ডিয়া' (ভারত বিষয়ক প্রবন্ধাবলি) ভারতের সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতঃপর তিনি ১৮৮৮ সালে লন্ডন থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী অধ্যাপকের চাকরি পান। এই সময়ে তিনি 'হোপ প্রাইজ'-এ পুরস্কৃত হন।

১৮৯২ সালে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কান্ট্রি মেডিসিন (ভেষজ ঔষধ)-এর ওপর গবেষণা শুরু করেন। ভেষজ রসায়নে তাঁর গভীর গবেষণা কর্ম তাঁকে নানাভাবে পুরস্কৃত করে। ১৮৯৪ সালে 'তৈল ও ঘৃতে ভেজাল' শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধটি *এশিয়াটিক সোসাইট অব বেঙ্গল জার্নালে* প্রকাশিত হয়। ১৮৯৬ সালে তিনি 'মারকুরাস নাইট্রেট' আবিষ্কার করেন। তাঁর তৈরি ভেষজ ঔষধাদি (হার্বাল কেমিক্যালস) ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কংগ্রেস কর্তৃক এক বিশেষ অধিবেশনে স্বীকৃতি লাভ করে এবং তাঁকে এই সময় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। আর একই বছরে তিনি বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রী গোপালকৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে পরিচিত হন। উভয় কংগ্রেস নেতা কর্তৃক প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁর গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। তিনি *সরল প্রাণিবিদ্যা* এবং *হিস্টরি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি ভল্যুম-১* নামে দুটি বই প্রকাশ করেন। ১৯০৩ সালে তিনি তাঁর নিজ গ্রাম রারুলিতে তাঁর পিতা হরিশ চন্দ্র রায়ের নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ১৯০৪ সালে ইউরোপিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউশন পরিদর্শনের জন্য তাঁকে ইউরোপ পাঠান।

তিনি লন্ডন, ডানডি, লিডস্, ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম, বার্নি, জেনেভা, জুরিখ, ফ্রাঙ্কফার্ট ছাড়াও ইউরোপের অন্যান্য বহু স্থান পরিদর্শন করেন এবং শেষে ফ্রান্সে যান। ১৯০৯ সালে তিনি আরেকটি বই *দ্য হিস্টরি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি ভল্যুম-২* প্রকাশ করেন। একই সময়ে তাঁর ছাত্ররা যথাক্রমে মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পুলিন বিহারি সরকার, রসিক লাল দত্ত, জ্ঞানেন্দ্র মুখার্জি, রসিকলাল দে, জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ এবং নীল রতন প্রমুখ প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন এবং তাঁরই বাসায় একসঙ্গে বসবাস করেন। এটা ছিল তদানীন্তন বাংলার বিজ্ঞান বিদ্যার

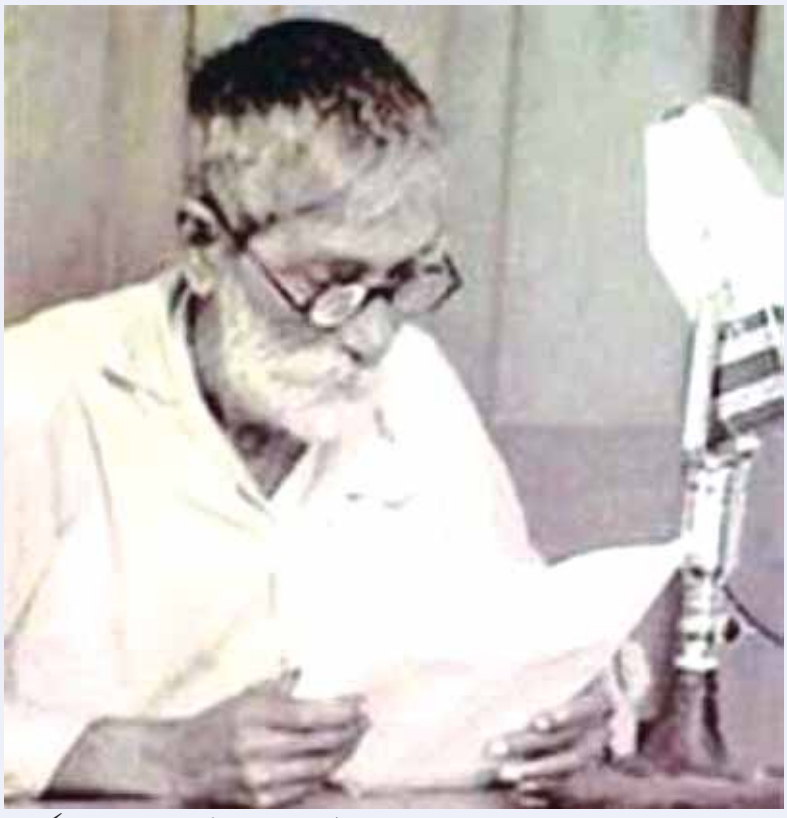

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)

যুগসন্ধিক্ষণ। ইতোমধ্যে ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সুনাম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে সারাভারতে। প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁর সহকর্মীদের পরামর্শক হয়ে গেছেন। তাঁর জনপ্রিয়তা উঠে গেছে তুঙ্গে। ১৯১০ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল লিটারারি কনফারেন্স তথা সাহিত্য মহাসম্মেলনে সভাপতি হন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে ব্রিটিশরাজ সি আই ই উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি ১৯১১ সালে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেন ডিএসসি ডিগ্রি (সম্মান)। দেশে ফিরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। তিনি ১৯১৪ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯১৭ সালে তিনি ভারতীয় সমাজ সংস্কার কমিটির সভাপতি হন। সারা বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের সংকল্পে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করলেন। তিনি বাগেরহাট কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন ১৯১৮ সালে এবং একই সালে তাঁর নিজ গ্রাম রারুলির এডুকেশন সোসাইটির ফান্ডে ১০ হাজার টাকা দান করলেন। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করে। এ বছরেই তিনি ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং চতুর্থবারের মতো ইংল্যান্ড গমন করেন। স্যার পিসি রায় বাংলাদেশের মহাদুর্ভিক্ষকালে খুলনায় দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ কমিটি গঠন করেন এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণের ত্রাণদানে প্রচুর অর্থ প্রদান করেন। তিনি নাগার্জুন পুরস্কার প্রবর্তনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ডে ১০ হাজার টাকা প্রদান করেন। তিনি ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত গরিব ও দুস্থ ছাত্রদের অধ্যয়ন প্রকল্প ফান্ডে ২.৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ১৯২২ সালে তিনি নিজে উত্তরবঙ্গে বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ সাহায্যে আত্মনিয়োগ করেন।

এ বছরেই চরকা ও খাদি শিল্পের উন্নয়নকল্পে তিনি ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন খাদি শিল্প সংস্থায়। ১৯২৩ সালে স্যার পিসি রায় উৎকল প্রাদেশিক এসেম্বেলির সদস্য নির্বাচিত হন এবং আহমেদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। এ বছরে তিনি ভারতে দ্য ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন। তিনি পুনরায় ১৯২৬ সালে পঞ্চমবার ইংল্যান্ড গমন করেন। ১৯৩১ সালে ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বাংলার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের মহাপ্লাবনে বঙ্গীয় ত্রাণ সমিতি গঠন করেন। ঐ বছরেই তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির সভাপতি হন। ডক্টর প্রফুল্ল রায়ের ৭০তম জন্মদিবস উপলক্ষে কলকাতা টাউন হলে তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আর এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এর পরের বছরে তাঁর আত্মজীবনী *লাইফ এন্ড এক্সপেরিয়েন্স অব এ বেঙ্গলি কেমিস্ট* প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে ক্যালকাটা রিভিউতে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালে তাঁকে ফেলো অব লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির (অনারারি) নির্বাচন করা হয়। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ফান্ডে এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন।

বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা *সওগাত*-এর সৌজন্যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সম্মানে এক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তৎকালের বহু খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব, বহু গুণী সাহিত্যিক এই সভা অলংকৃত করেন। ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৯ কলকাতার অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলার এ মহানুভব বিজ্ঞানী স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। ঠিক বেলা দুইটায় বিদ্রোহী কবি সভায় পৌঁছলেন। সমাগত সুধীমণ্ডলী প্রচণ্ড করতালির মাধ্যমে কবিকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। যথারীতি সভা অনুষ্ঠিত হলো কবির বিখ্যাত মার্চ সংগীত গাওয়ার মাধ্যমে আর গানটি যথারীতি গাইলেন কবিবন্ধু তৎকালীন প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী উমাপদ ভট্টাচার্য তাঁর সুললিত কণ্ঠে। সভাপতির ভাষণে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন,

> আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দু'জন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকার মৌলিকতার সন্ধান পেয়েছি। তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল। নজরুল কবি- প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেছেন। আজ আমি একইভাবে আনন্দলাভ করছি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমান কবি নন, তিনি বাংলার কবি, বাঙালির কবি। কবি মাইকেল মধুসূদন খ্রিষ্টান ছিলেন। কিন্তু বাঙালি জাতি তাঁকে শুধু বাঙালিরূপেই পেয়েছিলেন। আজ নজরুল ইসলামকেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। কবিরা সাধারণত কোমল ও ভীরু কিন্ত নজরুল তা নন। কারাগারে শৃঙ্খল পরে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা লিখেছেন, বাঙালির প্রাণে এক নতুন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।

অকৃতদার এই মহান মনীষী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জীবনাবসান ঘটে ৮৩ বছর বয়সে ১৬ই জুন ১৯৪৪ সালে। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

বিজয়ের তানপুরা

কাজী রোজী

হাসপাতালের করিডোর ছেড়ে
রাস্তায় নামলেন ডাক্তারেরা
তড়িঘড়ি তাদের উচ্চারণ–আজ বিজয় দিবস।
সেবক-সেবিকাদের উচ্ছল উচ্চারণ–আজ বিজয় দিবস।
শিক্ষক সমিতির নির্ভরযোগ্য উচ্চারণ–আজ বিজয় দিবস।
গার্মেন্টস-কন্যাদের আনন্দঘন উচ্চারণ–আজ বিজয় দিবস।
আহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিশ্বাসযোগ্য উচ্চারণ–আজ বিজয় দিবস।
দারুণ মুক্তিযোদ্ধাদের ঐকান্তিকতা
সাহসী ছাত্র-জনতার দুর্দম এগিয়ে চলা
বীরাঙ্গনাদের নিবিড় শপথের উচ্চারণ
আজ বিজয় দিবস।
গোটা দেশের বিজয়পতাকা ঘিরে আমাদের সবটা বাংলাদেশ
জাদুর পরশ পেয়ে
জাতীয় পতাকার সীমাবেষ্টনী তৈরি করে
বাজিয়ে চলেছে বিজয়ের তানপুরা।
আমার ইচ্ছেগুলো আকাশ বাতাস সাগরের ভালোবাসা নিয়ে
লাল-সবুজের পতাকার গভীর থেকে
একটি নতুন ধারাপাত তৈরি করে এখানে সেখানে তারা
বাংলার দিনলিপি সাজিয়ে দিল–
বলল বিজয় বাংলাদেশ।
সেই পতাকা জড়ানো বিজয়ের তানপুরায়
আমি বাংলার নারী
বাংলার পুরুষ
বাংলার মানুষ।

একাত্তরের মুক্তিসেনা

মোশাররফ হোসেন ভূঞা

একাত্তরের মুক্তিসেনা কেমন আছ ভাই
যুদ্ধদিনের কথা তোমার জানতে আমি চাই
তুমি যখন যুদ্ধে ছিলে শিশু ছিলাম আমি
বুঝিনি হায় দেশের জন্য যুদ্ধ কত দামি।
যুদ্ধে গিয়ে তুমি যখন গেয়েছিলে গান
আমার বাঁশি পেয়েছিল ফিরে নতুন প্রাণ।
সে বাঁশিটি তেমনি এখন আছে আমার কাছে
বুকে চেপে ধরে রাখি যায় হারিয়ে পিছে।
একাত্তরের মুক্তিসেনা শুনছ মায়ের ডাক
হায়েনাদের দোসর সবে দিচ্ছে কেমন হাঁক।
আবার বুঝি অস্ত্র ধরে যুদ্ধে যাবে তুমি
দোহাই তোমার আমায় নিও ডাকলে জন্মভূমি।
একাত্তরে যাইনি বলে আর কি যাব না
আসছে সময় এমন সুযোগ আবার পাব না।

বিশ্বসেরা বাংলা ও বাঙালি

সোহরাব পাশা

সকল দেশের সেরা এ দেশ নিরবধিকাল
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নভূমি, গৌরবোজ্জ্বল পতাকা সবুজ-লাল
নিশি জাগা পাখি ডেকে আনে মুগ্ধ প্রসন্ন সকাল,
সোনালি ধানের ছড়া দোল খায় নিরিবিলি উতলা বাতাসে
কৃষকের স্বপ্নময় চোখজুড়ে যেন জোছনার ফুল হাসে
জেনে গেছে দূর বিশ্ব বাঙালিরা নয় আর নিঃস্ব
'পদ্মাসেতু' দিয়ে নতুন দিনের স্বপ্ন হেঁটে আসে;
দেশের উন্নয়নে গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা
স্বপ্ন দেখেন সব নিঃস্ব-দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে
তিনি ভালোবাসেন এ দেশের মাটি– এর প্রতিটি ধূলিকণা,
'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়তে স্বপ্ন দেখেন দিবা-রাত্রি
দিন বদলের প্রত্যয়ে দুর্বিনীত আপোশহীন বঙ্গবন্ধু-কন্যা
মানুষের হৃদয়ের ভাষা পড়তে পারেন তাই তিনি প্রিয় জননেত্রী।
ছোট্ট এই দেশটাতে চাই পরিকল্পিত জনসংখ্যার অধিবাসী
যেন থাকে না কোথাও দরিদ্রজনের হাহাকার, অভাবের সংসার
সবার চোখেমুখে ফুটে থাকবে স্বপ্নভরা আনন্দের হাসি,
পরিকল্পিত ছোট্ট পরিবার চাই প্রতি ঘরে দেশটাকে ভালোবেসে
থাক নারী ও পুরুষের সমঅধিকার, সকলের সম্প্রীতির বন্ধন
পাঠ শেষে শিশু-কিশোর দৌড়ে যাবে হাসি-খুশি মায়ের পাশে,
সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই
ছেলে হোক আর মেয়ে হোক দুটির অধিক নয়
বিশ্বের সেরা বাংলা ও বাঙালি এই হোক পরিচয়।

আলোক আঁধার

মনসুর জোয়ারদার

বক্ষজোড়া আমার ভুবন
সাধারণ এ মাটিকে ঘিরে,
প্রিয় ভুবনের আলো ছড়িয়ে রয়েছে
বনানীর ফাঁকে ফাঁকে, সাগর অন্তরে
প্রাসাদ পেরিয়ে মানবেতর বস্তিতে
সকল সৃষ্টির চেতনায়, স্তরে স্তরে।
অন্ধকার তা সে ঘন কালো হোক যত
আমি যে তাকেও পেতে চাই অবিরত,
জানি ঐ অন্ধকারের পরতে পরতে মেশে
বৈচিত্র্যময় দেশজ অনুভূতি গভীর আবেশে;
আঁধারি স্তব্ধতা বন্যতায় সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে
গড়ে তুলি আমার ভুবন তিলে তিলে ঘূর্ণিপাকে।
আলোকোজ্জ্বল বাহার
ভয়ালতম আঁধার,
তোমাদের সাথে হলো যাত্রা শুরু তাই
এখন গায়েনের বেশে যেদিকে তাকাই
চোখে ভাসে প্রকৃতির সহজাত মোহিনীস্বরূপ
পাশাপাশি কখনো বা পাই সংহারময়ী অরূপ!
মাটি ও জীবন ভালোবেসে দেখো আমি ভালোবাসি
দিনের অবাধ আলো, আর
রাতের নিকষ অন্ধকার;
অনাদিকালের পটে সাধ করে তাই ছবি আঁকি
এ মাটির আনন্দ-দুখের
পুবালির শাশ্বত মুখের।

এমু পালনে বাংলাদেশের সম্ভাবনা

মো. আতিকুর রহমান মুফতি

সাদা, ধূসর ও হালকা বাদামি পালকে ঢাকা এমু পাখির বাণিজ্যিক পালন গ্রামবাংলায় আনতে পারে স্বনির্ভরতার বিপ্লব। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় পাখি এমু আকারে বৃহৎ হওয়ায় বাংলাদেশেও বাণিজ্যিক চাষ সম্প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

উচ্চতার বিচারে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম পাখি এটি। যা অনুকূল পরিবেশে প্রজাতি ভেদে ছয় দশমিক দুই ফুট পর্যন্ত উচ্চতা লাভে সক্ষম। পাখি হলেও উড়তে পারে না এমু। তবে প্রয়োজন হলে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার গতিতে দৌড়াতে পারে। পানিতে নেমে সাঁতারও কাটতে পারে। খাবার গ্রহণে কোনো বাছবিচার করে না।

সর্বভুক শ্রেণির হলেও সপ্তাহকালের অধিক খাদ্য ছাড়াই স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত এরা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও শ্রবণ ক্ষমতার কারণে দূর হতে বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে যায় এমু। এদের পালক ও পুচ্ছের রং কালো হলেও ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে পুচ্ছ ও পালকের রং ভিন্ন হয়। স্ত্রী এমু পুরুষের চেয়ে আকারে কিছুটা বড়ো। একটি স্ত্রী এমুর ওজন ৫৮ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। এদের প্রজনন মৌসুম মে-জুন মাস। একটি ডিমের ওজন ৬৫০ গ্রাম পর্যন্ত হয়। পুরুষ পাখি ডিমে তা দেয়। আট সপ্তাহ পরে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়ে আসে। এমু সমাজে বাচ্চা দেখাশুনা পুরুষকেই করতে হয়। ছয় মাস বয়সে পূর্ণতা পেলেও পরবর্তী প্রজনন মৌসুম পর্যন্ত পরিবারের সাথেই থাকে নবীন এমুরা। বন্য পরিবেশের পাখি হলেও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ, পেরু ও চীনে খামার পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে এমু পালন করা হয়। এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বিগত বছরগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা, কেরালা, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ব্যাপকভাবে এমু চাষ চলছে। বেড়ে চলছে খামারের সংখ্যা। খামারিরা নিজস্ব প্রযুক্তিতে ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করছে। ২০১২ সাল থেকে ভারত সরকার এমু পালনের বাণিজ্যিক উদ্যোগকে পৃষ্ঠপোষকতাও দিচ্ছে।

পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও। খুলনা জেলার বাটিয়াঘাটা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আশরাফুল আলম খান উপজেলা শহরের পাশেই গড়ে তুলেছেন এমনই একটি এমুর খামার। টেলিফোনে খামার সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার খামারে ১৮০টি এমু ও দুটি উট পাখি আছে। যাদের ওজন ৪৫ থেকে ৫০ কেজির মধ্যে। ইতোমধ্যে তার এমুগুলো ডিম দিতে শুরু করেছে, যা তিনি প্রাণিসম্পদ বিভাগের ইনকিউবেটরে পাঠিয়েছেন বাচ্চা ফুটানো যায় কি না পরীক্ষার করার জন্য। বাংলাদেশের পরিবেশে এমুর মৃত্যুহার অনেক কম। এমুর মাংস সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও জনপ্রিয় হবে বলে তিনি আশা করেন। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এমু চাষ জনপ্রিয় করতেই তার এই উদ্যোগ। এ প্রসঙ্গে খুলনার জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. অরুন কান্তি মন্ডলের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বক্তব্যের সাথে সহমত পোষণ করেন।

পাখিটির শরীরের শতকরা পঁচানব্বই ভাগই মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার যোগ্য। এই পাখির মাংস থেকে শুরু করে ডিম, পালক, চামড়া, ডিমের খোলস পর্যন্ত প্রতিটি জিনিসই বিক্রি হয় চড়া দামে। এর মাংসে চর্বির পরিমাণ অনেক কম, প্রায় এক দশমিক পাঁচ শতাংশের নিচে। এ কারণে মধ্যপ্রাচ্যে এমুর মাংসের বিশেষ জনপ্রিয়তা আছে। এমুর চামড়ার নিচে থাকা স্তরীভূত চর্বি ঔষধি গুণসম্পন্ন যা প্রদাহ প্রতিরোধী ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে সমাদৃত। আর্থ্রাইটিস চিকিৎসায় এর চর্বি থেকে প্রাপ্ত তেলের ব্যবহার আছে বলে জানা যায়। এমুর চামড়া দিয়ে তৈরি হয় দৃষ্টিনন্দন মানিব্যাগ, হাতব্যাগ, জুতা ও পরিচ্ছদ।

আমাদের দেশে বৃহৎ পুঁজির বিশেষ অভাব থাকায় ক্ষুদ্র পুঁজি নিয়ে বেকার যুবা কিংবা গৃহিণীরা সহজেই এমু পালন করতে পারেন। যা দেশের আমিষের জোগান বৃদ্ধির পাশাপাশি পারিবারিক বা ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। অন্য গৃহপালিত প্রাণীর ন্যায় পরিবারভিত্তিক এমু খামারই হতে পারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রোল মডেল। মধ্যপ্রাচ্যে এমুর মাংস বেশ জনপ্রিয়। ফলে এমু উৎপাদন দেশে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নিতে পারলে এটি রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের নতুন সংযোজন হতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে টেকসইভাবে বাস্তবায়নের দ্বারা দরিদ্র ব্যক্তি বা পরিবারকে স্বাবলম্বী করে তোলার মাধ্যমে এসডিজি'র লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে ২০২০ সালের মধ্যে অতিদারিদ্র্যের হার ৮ শতাংশ ও সামগ্রিক দারিদ্র্যের হার ১৮.৬০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে এমু চাষ হতে পারে নতুন হাতিয়ার।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, খুলনা

স্বাধীনতার ছবি

বাতেন বাহার

শহর থেকে একটু দূরে সবুজ সোনার গাঁও
দেখবে এবং শুনবে সেরা গল্প, যদি যাও!
বোশেখ মাসে রাঙে যেথা জামের রসে ঠোঁট
দেখবে লিচু, আমের বনে ডানপিটেদের জোট।
আষাঢ় মাসে বনময়ুরী-কদম-কেয়া নাচে
কাঁঠাল পেকে গন্ধ ছড়ায় তখন কাঁঠাল গাছে।
ভাদ্রে গেলে বিভোর হবে তালের গন্ধে মন
আর আশ্বিনে মন মাতাবে শিউলি ফুলের বন।
কাশের মেয়ে মায়ের সাথে দেয়রে যেথা আড়ি
শোক শিশিরে ভিজে তখন কাশের ঘর ও বাড়ি।
সাঁঝ আকাশে ধুলোর পথে রেলের গাড়ি ছোটে
বিলের জলে কলমি এবং পদ্মকলি ফোটে।
বিলের পাশে একটি বাড়ি ধন ধান্যে ভরা
যার কাহিনি গল্পে শত, লিখছে কবি ছড়া।
ছড়ায় আঁকা একটি বাড়ি, একটি সবুজ মাঠ
এক ফসলের পরে যেথায় ভিন্ন ফসলের পাট।
শীতের ফসল মুগ, মসুরি, সরষে, তিষি, রাই
কলাই ক্ষেতে দেখবে বাঁধা কাজ্‌লা দুধের গাই।
দেখবে গেলে ধনে পাতার গন্ধ কেমন কড়া
তবে অনেক গাছের পাতা, দেখবে ঝরা-মরা।
শীত তবুও, পাখির গানে ভাঙে খোকার ঘুম
ভোর না হতে খুকুর গালে সূর্য আঁকে চুম!
রাতের বেলা পিঠের আসর, সঙ্গে বাউল গান।
খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি, টাটকা রসের ঘ্রাণ।
শীতের প্রিয় রসের হাঁড়ি, প্রিয় রসের পিঠে
পায়েস, পুলি সবই যেন মধুর চেয়ে মিঠে।
শিম, টমেটো, লাউয়ের ডগা, নালতা শাকের আঁটি
স্বাধীনতা যুদ্ধে যে গাঁ ছিল-যুদ্ধ ঘাঁটি।
যুদ্ধ ঘাঁটি পীযূষ খাঁটি-ভালোবাসার ডেরা
আজও যে গাঁ মা ও মাটির স্বপ্ন সাধে সেরা!
স্বপ্ন সাধে মা, মাটি, দেশ এবং 'অমর কবি'
'অমর কবি' রক্তে রাঙা স্বাধীনতার ছবি।

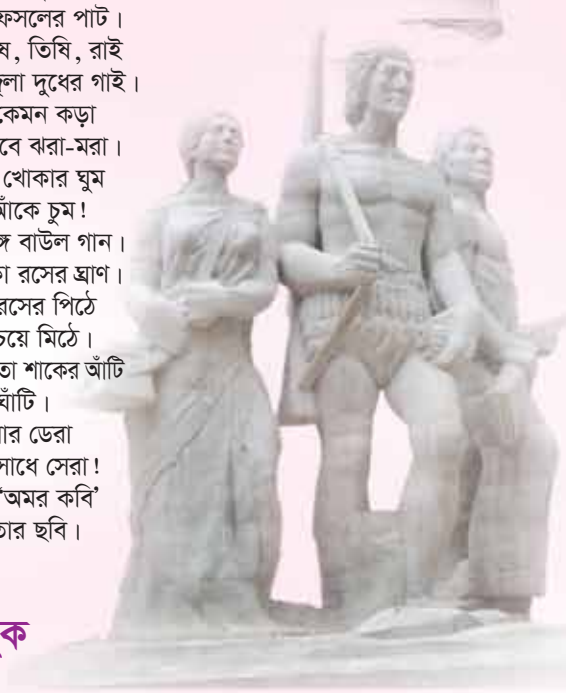

কৃষ্ণের বাঁকানো ধনুক

শাহ আলম বাদশা

নত হতে হতে আমি হলাম কৃষ্ণের বাঁকানো ধনুক
তোমার হৃদয়পদ্মেও বিদ্ধ হয়েছে আমার হৃদয় তীর
তুমি কি দেখো না আমার অঝোর হৃদয়ক্ষরণ
আর কত নত হলে তুমি তবে পরাবে জিঞ্জির?
তুমি নন্দিত কুসুম ছন্দিত সুর
আমি বেভুল এক বিরহীবিধুর;
তুমি কলি আমি অলি তালে-তালে চলি
কেন ছুটি, খাই লুটোপুটি একি তবে ভুল?
তুমি তো আগুন আমি গলে যাওয়া মোম
ক্ষতি নেই না দিলেও সাড়া, ভালোবাসি খোদার কসম!

ক্লান্ত-শ্রান্ত

জাকির হোসেন চৌধুরী

বেশি হিসাবি হতে গেলে
হিসাব মেলানো দায় হয়
কেবল বাড়ে জীবনের জটিলতা
সেই জটিলতার অঙ্ক থেকে
যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ
কোনো ফলাফল দিতে পারে না
লাভটা তাহলে কার হলো?
বেশি গোছাতে গেলে
গোছানো জিনিস খুঁজে খুঁজে
ক্লান্ত-শ্রান্ত
কেবল বেলা বেড়ে যায়
নদীর জল শুকিয়ে
কঙ্কাল নদীর ভেতরে
মাছেদের ফসিল জেগে থাকে
এতটা গোছাতে গিয়ে
লাভ কার বেশি হলো?
বেহিসাবি দখিনা বাতাস
উড়িয়ে নেয় তোমার চুলের ঘ্রাণ
টিএসসির মোড়ে
দিনগুলো উড়ে উড়ে চলে বাতাসে
বাতাসে সেই বকুলের ঘ্রাণ
আজও জমা বুকের ভেতরে।

অন্তঃশীলা

অঞ্জনা সাহা

অনাসক্ত ঠোঁটে জমে না প্রেমের পদাবলি
ঝুটো মুক্তোর মতো ঝরে পড়ে কপট চুম্বন।
উপেক্ষায় একদিন তঞ্চকের মতো
ছেড়ে গেছ মোহময় ভূমি
বিষণ্ন প্রতিমার দুই চোখে জমাট বেঁধেছে দেখো
ঘন নীল তীক্ষ্ণ অন্ধকার।
যেন শেষ বিকেলের ম্লান আলো
ডুবে যায় প্রগাঢ় আঁধারে
তবু তার আমূল নিশ্বাসে ছড়িয়ে পড়ে
ঝরা বকুলের তুমুল সুবাস
এবং তার নিবিড় আর স্পর্শময় আবহে
জেগে ওঠে মৃত ভায়োলিন।
তার চোখ থেকে অনায়াসে
অপ্রতিরোধী মেঘ সরে যায়
জ্বলে ওঠে হিরণ্ময় আলোকের অপরূপ শিখা।
উপেক্ষার আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে গড়ে তোলা
ওই অসাধারণ রুপালি নদীতে
জমে ওঠে লুকোচুরি খেলা।
সেই মুহূর্তে চাঁদ যেন মোহান্ধ জাদুকর
দূর থেকে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে যেতে চায়
তার অন্তঃশীলা গূঢ়তর জলে।

নিবন্ধ

দলিত ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: উন্নয়ন কৌশল

আজহারুল আজাদ জুয়েল

বাংলাদেশে সমতল ভূমি বৈশিষ্ট্যের উত্তরাঞ্চলকে বলা যেতে পারে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সমৃদ্ধ একটি অনন্য এলাকা। মূল জনগোষ্ঠী বাঙালির পাশাপাশি সান্তাল, উঁড়াও, মুন্ডা, পাহাড়ি, মুশোহর, কড়া, নুনিয়া, তুরি, তেলি, তাঁতি, রাজওয়ার, মালে, মাহলে, মাহাতো, কুরমি, কোল, কোডাসহ বহু সংখ্যক নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে রাজশাহী-রংপুর বিভাগের এই সমতল ভূমি অঞ্চলীয় ১৬ জেলায়। এ ছাড়াও রয়েছে বিপুল সংখ্যক দলিত মানুষ– যাদের প্রায় সবাই শিক্ষা, সেবা, সুবিধা প্রাপ্তির দিক থেকে মূলধারার জনগোষ্ঠীর তুলনায় পিছিয়ে আছেন। হরিজন, ডোম, মুচি, জেলে, বেদে এই ধারারই জনগোষ্ঠী যারা নানান কুসংস্কারের শিকার হয়ে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছেন এবং নিজেদের ন্যায়সংগত অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকছেন।

সরকার পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীকে সমান্তরাল ধারায় তুলে আনতে চায়। মূলধারার জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি থেকে দলিত ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীও যেন প্রকৃত মানুষের মর্যাদায় বেঁচে থাকতে পারে, সুস্থ-সুন্দর ও মর্যাদার সাথে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে পারে এবং সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে সেই রকম প্রচেষ্টা রয়েছে সরকারের। সেই লক্ষে রয়েছে সরকারের নানামুখি উদ্যোগ। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থাও কাজ করছেন তাদেরকে সমান্তরাল ধারায় তুলে আনার জন্য।

জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোরও নানান উদ্যোগ আছে অবহেলা, বঞ্চনার শিকার নৃতাত্ত্বিক ও দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য। কিন্তু যাদের জন্য এইসব আয়োজন তারা নিজেরাই তা ভালমতো জানেন না। তারা বোঝেন না যে, সরকারের কাছে তারা কী সুযোগ-সুবিধা পাবেন? যে সুবিধাগুলো পেতে পারেন সেগুলো তারা কীভাবেই বা পাবেন? কোথায় গেলে পাবেন? যেহেতু তারা বিষয়গুলো ভালোভাবে জানেন না ও বোঝেন না ফলে তারা তা আদায় করতে পারছেন না। সরকারের সেবাখাতগুলো সম্পর্কে অজ্ঞতাজনিত কারণে তারা সেইসব অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকছেন। এর অবসানের জন্য গত অক্টোবর মাসে একটি তথ্যপুস্তিকা প্রকাশ করেছে বেসরকারি সংস্থা এনএনএমসি-নেটওয়ার্ক ফর নন-মেইনস্ট্রিমড মার্জিনালাইড কমিউনিটি। পুস্তিকাটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'সমতলের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি ও বেসরকারি সেবা তথ্যপুস্তিকা।' ১৫ই নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ঢাকার ছায়ানটে তথ্য পুস্তিকাটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ হয় আমারও। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জিললার রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে পুস্তিকাটির মোড়ক উন্মোচন করেন। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিচালক, নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহি পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা রোকেয়া কবির, হেকস/ইপার-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর অনিক আসাদ, এনএনএমসি'র চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক বিমল চন্দ্র রাজোয়ারসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন এই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে। একই অনুষ্ঠানে সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিত জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য রেখে 'বাঁচার মতো বাঁচতে চাই আমার অধিকার আমি চাই'– শীর্ষক একটি কৌশলপত্রের প্রকাশ করা হয়। ঐ কৌশলপত্র সামনে রেখে ২০২১ সাল পর্যন্ত এনএনএমসি কার্যক্রম পরিচালনা করবে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের দলিত ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে।

তথ্য পুস্তিকায় সরকারি সেবা প্রাপ্তির বিভিন্ন খাত, সেবা প্রাপ্তির উপায় ও পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। পুস্তিকার তথ্যগুলো শুধু এনএনএমসি'র জন্য নয়, রংপুর-রাজশাহী বিভাগে দলিত ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের কলাণে কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য সহায়ক হবে। পুস্তিকাটির শুরুতে দলিত ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর অধিকারের আইনগত ভিত্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক নথি, জাতিসংঘসহ বিভিন আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের গৃহীত নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে যাতে করে আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, রাষ্ট্র ও সমাজের কাছ থেকে কী কী অধিকার তারা পেতে পারেন, তাদের অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কী ভাবা হয়। তারা কতখানি অধিকার প্রাপ্তির অধিকার রাখেন। পুস্তিকার আরেক সূচিতে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত দেশীয় নীতি-আইন-কর্মপরিকল্পনা, সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতি ও পরিকল্পনা, দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতি ও পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এখান থেকেও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিত জনগণ তাদের সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, কর্তব্য, অঙ্গীকার সম্পর্কে জানতে পারেন এবং এইসব বিষয়ে রাষ্ট্রের গৃহীত কর্মসূচির সুফল পেতে পারেন।

জনকল্যাণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের বহুমুখী কর্মসূচি আছে যার সবগুলোতেই সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিত মানুষেরা ভাগ বসানোর অধিকার রাখেন। কিন্তু সচেতনতার অভাবে সেইসব অধিকারের কোনো খবরই তারা জানেন না। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, পেশাগত উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন, নিজেদের ঘরবাড়ির উন্নয়নসহ সকল কিছুতেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিতদের জন্য সরকারের বরাদ্দ আছে। সরকার বিভিন্ন নামের যে সকল বৃত্তি, উপবৃত্তি, ভাতা ইত্যাদি দিয়ে থাকেন সেগুলোতেও তাদের ভাগ আছে। বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, পঙ্গুভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতাসহ সব ভাতাই পাবেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিত শ্রেণির মানুষ। কিন্তু সেই সুবিধাদি সরকারের কাছ থেকে পাওয়ার পদ্ধতি ও উপায় সম্পর্কে তাদের জানা থাকে না। বেশিরভাগ সময় শুধু ইউনিয়ন পরিষদ কিংবা পৌরসভার চেয়ারম্যান, মেম্বার, কাউন্সিলরদের কাছে যান যা অনেক সময় ফলপ্রসূ হয় না। এই সুবিধাগুলো পাওয়ার জন্য সরাসরি সরকারের কাছে কিংবা সরকারের উপযুক্ত প্রতিনিধির কাছে যেতে হয়। কিন্তু কীভাবে সরকারের কাছে যাবেন, সরকারের কোন প্রতিনিধির কাছে যাবেন, যাওয়ার উপায়-পদ্ধতি কী তা জানা নেই অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিত মানুষের। তথ্যপুস্তিকার মধ্যে এই সমস্যাগুলোর সমাধান আছে। অধিকার, মর্যাদা, সুবিধা ও সুযোগ কার মাধ্যমে, কী পদ্ধতিতে অর্জন করা সম্ভব হবে সেই উপায়ের কথা বলা আছে এই তথ্যপুস্তিকায়।

সরকার এবং রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার, সুযোগ-সুবিধাদি পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ইউএনও ও সমাজসেবা বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও যুব অফিসের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। মূলত সেই কৌশল, পদ্ধতি, উপায় জানিয়ে দিতেই দলিত ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের অধিকার সমুন্নতকরণ ও সুরক্ষার তথ্যপুস্তিকা ও কৌশলপত্র প্রকাশ করেছে এনএনএমসি। এগুলো প্রকাশের তিনটি উদ্দেশ্য আছে এনএনএমসি'র। প্রথমত স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দলিত ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, রাষ্ট্রীয় সেবাদাতা, মূলধারার মানুষ ও সমমনা নেটওয়ার্কের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। দ্বিতীয়ত দলিত ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী পর্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা। তৃতীয়ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা, অ্যাডভোকেসি কৌশল প্রতিষ্ঠা করা।

উত্তরবঙ্গ বা রংপুর-রাজশাহী বিভাগে ২৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রায় ১৬ লাখ মানুষ বসবাস করে থাকেন। এছাড়াও আছে হরিজন, ডোম, মুচি, বেদেসহ বিপুল সংখ্যক দলিত মানুষ। এই বিপুল মানুষকে পেছনে রেখে বৃহৎ জনগোষ্ঠী যতই এগিয়ে যাক না কেন সেটা কখনোই টেকসই হবে না। টেকসই হতে হলে সাইকে নিয়ে হতে হবে।

যে তথ্যপুস্তিকা এবং কৌশলপত্র নিয়ে এনএনএমসি কাজ শুরু করতে যাচ্ছে সেটা একটা কার্যকর উদ্যোগ হবে বলে আমার ধারণা। পিছিয়ে পড়া জনগণ যখন নিজেই নিজের অধিকার বুঝবেন তখন তাকে কেউ আটকিয়ে রাখতে কিংবা পেছনে ফেলে রাখতে পারবে না।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

মনে পড়ে ষোলোই ডিসেম্বর

জায়েদুল আলম

মনে পড়ে সাতচল্লিশ বছর আগে
এই দিনে ষোলোই ডিসেম্বরের কথা।
আমি একা কিশোর যুবা–
নড়াইলের মুক্তাঞ্চলে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে।
বন্দি স্বাধীনতাকে মুক্ত করতে গেলে,
ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে পড়ে হানাদারদের ক্রোধের আগুনে।
বসতবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়,
বেঁচে থাকতে চায় খিদের জ্বালায়।
ছটফট করে,
খাদ্য আর পানি থাকে শত্রুর দখলে অবরুদ্ধ কারবালায়।
এক আজলা পানি মুখে দিতে গেলেই ভেসে ওঠে
পিপাসার্ত নিষ্পাপ শিশুর মুখ, পরিবার-পরিজনের বিষণ্ন মুখ।
নড়াইল, যশোর, ভেড়ামারা, ফরিদপুর, রাজশাহী, রংপুর,
সমগ্র বাংলাদেশ
দখলদারের ভারী বুটের তলায় আর সঙ্গিনের মুখে।
অনেক মাথার খুলি খুনির বুলেটে গেছে উড়ে।
সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের লাল রং রবি
স্বাধীনতাকে মুক্ত করতে কত রক্ত বুক থেকে ঢেলে পড়ে গেছে এই ছবি।
মাতা-ভগ্নি-স্ত্রীর-বান্ধবীর নয়নের নীর
বৃষ্টি শিশির হয়ে ঝরে গেছে দেখো মনে করে।
পেছনে হাত-পা বাঁধা কত লাশ বুদ্ধিজীবীর,
সারাদেশে ত্রিশ লক্ষের গণকবর। কাকে সান্ত্বনা দেবে–
কখন যে হানাদার জল্লাদেরা আসে এই ভয়,
সারাদেশে বন্দিদশা হয়ে যায় মনে হয় কখন মরণ।
পালাও, নিশ্চিন্ত চলা-খাওয়া-ঘুম এ অবস্থা নয়–
ধরে নিয়ে হত্যা করে এ কথা কি হয় না স্মরণ।
দখলদারদের গুলি বেয়োনেট পবিত্র নারীকে নির্যাতন।
বীরযোদ্ধারা মুক্ত করে বাংলাদেশকে।
শুধু মনে পড়ে,
ষোলোই ডিসেম্বর-বিজয় দিবসে স্বাধীনতার কথা–
তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ।

ধন ধান্যে

লিলি হক

৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
বজ্রশপথে উচ্চারিত কণ্ঠ
উল্লাসে উজ্জীবিত মানুষ শোনে
শুদ্ধতম মানবের আহ্বান।
জ্বলে ওঠে সারা বাংলায় শিখা অর্নিবাণ,
জনতার কাতারে মুহুর্মুহু স্লোগান
জয় বাংলা ধ্বনিতে
মুক্তির নেশা ধরায় শোণিতে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
প্রাণের উত্তাপে অসংখ্য তরুণ, মধ্যবয়সি,
কিশোর মুষ্টিবদ্ধ প্রতিজ্ঞায় অটল
প্রত্যাশা সোনার বাংলায় ভরবেই
ধন ধান্যে নবান্নের ফসল।
মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষে
ষোলোই ডিসেম্বর, বিজয় এসেছিল আমাদের
জীবনে লাল-সবুজের পতাকার স্বাক্ষর।

টেকসই ভালোবাসা

রুস্তম আলী

ভালোবাসা-ভালোলাগা প্রকৃতির বন্ধন।
কিছু কিছু মানুষ ভালোবেসে হয়ে যায় অন্ধ।
গভীর ভালোবাসা-গহীন ধন-অস্পষ্ট লেখা চিঠি
কত মধুর স্মৃতি–ডাকহরকরার প্রীতি।
টেকসই ভালোবাসার রীতি।
টুইটার, ইমো, ফেসবুকে
ভালোবাসার রূপকথা লেখা
এর নাম ডিজিটাল ভালোবাসা।
মেসেজ, সিন, রিপ্লাই– জানা নাই,
চেনা নাই, দেখা নাই,
রং নাম্বার মিস্‌কল
ভয়ংকর রূপ, ফেসবুকে ভাইরাল।
মানুষ এবং মানুষের ফেসবুক আইডির দূরত্ব–
মিনিমাম এক আলোকবর্ষ।
হতে পারে ব্ল্যাক মেইল
নয়ত বা মাদকসেবী–
বোঝার উপায় কী?
যাচাই-বাছাই করে
ভালোবাসা নিন চিনে
সূক্ষ্ম বিচারবোধ থাকে যেন সব্বার।

জয় বাংলার শক্তি

নাহার আহমেদ

হাহাকারের বিরাণভূমিতে
মুক্তির সিম্ফনীতে মিলিয়ে গেছে
আর্তনাদের ধ্বনি।
হৃদয়ের তন্ত্রীকে জাগ্রত করে আজ
বিজয়ের সেই উল্লাস।
রক্তের নদী পেরিয়ে ছিনিয়ে এনেছি
নিজেদের অস্তিত্ব।
আমরা বাঙালি। মৃগনাভী সুখে আজ
আপ্লুত। বিজয়ডঙ্কার সেই প্রচণ্ড কম্পন
আজ অনুরণিত, বাংলার মাটিতে
অহংকারের নির্যাসে সিক্ত
শত কোটি বাঙালির অন্তরাত্মা।
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ায়
যে স্বর্ণালি আভা আজ প্রজ্বলিত
তা এই বাংলার সন্তানদের রক্তে
প্রস্ফুটিত স্বাধীনতার ফসল।
জয় বাংলার প্রচণ্ড শক্তি, সাহস আর
হুংকার চিরস্থায়ী। চির অম্লান। জাগ্রত
বাঙালির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহমান।

দহন

ইফ্‌ফাত আরা দোলা

ঝপ ঝপ ঝপ পানি ঢেলেই চলেছে রাহেলা। পুরো শরীরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে। বালতির পর বালতি ঢেলেই চলেছে সে। তবুও যেন পরিষ্কার হয় না তার ক্লেদাক্ত শরীর। প্রচণ্ড ঘৃণায় ইচ্ছে করছে নিজের শরীরটাকেই পুড়িয়ে দিতে। তাতেও যদি নিস্তার পাওয়া যেত এ অসহ্য যন্ত্রণা থেকে। রোজ রাতে এই একই ঘটনা। কতদিন ধরে একটা রাতও ঘুমুতে পারে না সে। সারাদিনের ক্লান্তিতে চোখটা কখনো সখনো লেগে আসে ঠিকই, কিন্তু এই নিরন্তর দহন তাকে শান্তি দেয় না মোটেও। কেমন পাগল পাগল লাগে তার। হঠাৎ মনে পড়ে, জহির জেগে যায়নি তো? সন্তর্পণে গোসলখানা থেকে বেরিয়ে আসে। ঝুঁকে পড়ে জহিরের মুখটা দেখে সাবধানে। নাহ্, ঘুমুচ্ছে জহির। খুব সাবধানে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাহেলা। জহিরকে সে কিছুতেই জানতে দিতে চায় না তার নির্ঘুম রাতের কথা। প্রতি রাতের এই যন্ত্রণা না হয় লুকোনোই থাক ওর কাছে। না, এমন নয় যে জহির ওকে ভালোবাসে না। বাসে। তবু লুকোয় রাহেলা। শুধু শুধু অস্থির হবে মানুষটা। ওর সবটাই জানে জহির। তবু লুকোয়। দু'জনেই অভিনয় করে দু'জনের সামনে। যেন কেউ কিচ্ছুটি জানে না। কারোরই কিছু মনে নেই। জহির ভুলে যেতে চায় সবকিছু। নতুনভাবে জীবন শুরু করতে গেলে কিছু কথা ভুলে যেতেই হয়। জহির চায় রাহেলাও ভুলে যাক তার দুঃসহ স্মৃতি। কিন্তু ভুলতে চাইলেই কি সবকিছু ভোলা যায়? কিছু কিছু স্মৃতি কষ্টের হলেও আজীবন বহন করে যেতে হয়।

দিনের বেলাটা রাহেলার ভালোই কাটে। সকালে জহির বেরিয়ে পড়ে কাজে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সর্বত্রই হাহাকার। এর মাঝেই কীভাবে যেন একটা কাজ জুটিয়ে ফেলেছে সে। বেশ পরিশ্রম হয় ওর, বুঝতে পারে রাহেলা। আর তো কিছু করারও নেই। এভাবেই উঠে দাঁড়াতে হবে।

–দেশটাও একদিন আর এমন থাকবে না, বুঝলে? যে দেশ মাত্র ৯ মাসে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারে, সে দেশ স্বনির্ভর হতে ক'বছরই আর লাগবে?

রাহেলাকে বোঝায় জহির। কিছুটা বুঝে কিছুটা না বুঝে ও মাথা দোলায়। জহিরের কথাতেই রাহেলা পাড়ার একটি স্কুলে চাকরি নিয়েছে। জহির বেরিয়ে যাবার পর ও স্কুলে যায়। পড়ালেখায় রাহেলা ভালোই ছিল। কিন্তু বিএ ফাইনালটা আর দেওয়া হয়নি। এরমধ্যেই শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। মফস্বলের মেয়ে হলেও বাবা তাকে পড়ালেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন সবসময়। স্কুলশিক্ষক বাবা চাইতেন, তার দুই ছেলেমেয়েই শিক্ষিত হোক, মানুষ হোক। কিন্তু মা চেয়েছিলেন রাহেলা বড়োজোর আইএ অব্দি পড়ুক। এর বেশি লেখাপড়া করে মেয়েদের কী লাভ! সেই তো সংসার নিয়েই কেটে যাবে বাকি জীবন। বিয়ের পর নিজের ইচ্ছেতে কিছুই হয় না। মেয়েদের অত খায়েশ থাকতে নেই, বাপু। বড়ো ছেলেটা ঢাকায় থেকে পড়ছে পড়ুক। মেয়েদের আবার অত পড়ালেখার ঘটা কীসের!

মায়ের কথা কানেই তুলত না রাহেলা। ছোটোবেলা থেকেই ওর ছিল বই পড়ার নেশা। সেই নেশার যোগান ভালোভাবেই জোগাতো বাবা। বাড়িতে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত তো ছিলই, আরো কত কত

বই লাইব্রেরি থেকে এনে দিতেন বাবা। ছুটির বিকেলগুলো কাটত আবৃত্তি দিয়ে। বাবার প্রিয় ছিলেন নজরুল। প্রথমে বাবাই আবৃত্তি করতেন। তারপর ভাইজান। আর সবশেষে ডাক আসত রাহেলার। বাবাই ছিলেন বিচারক। শুরুতে কবিতাগুলোর মানে বুঝিয়ে দিতেন। তারপর ফলাফলের পালা এলে দুজনকেই বিজয়ী ঘোষণা করতেন। রাহেলার মন খারাপ হতো খুব। বাবার গাঁ ঘেষে দাঁড়িয়ে ঘ্যান ঘ্যান করত,

–ও বাবা। একদিন শুধু আমাকে ফার্স্ট কর না। আমি কি ভাইজানের থেকে ভালো আবৃত্তি করি না, বলো?

বাবা মিটিমিটি হাসতেন। বলতেন, তোরা দুইজন তো আমার দুই চোখের মণি। আমি কাকে ছেড়ে কাকে রাখব, বল্ তো মা?

বাবার কথা শুনে মন একটুও ভালো হতো না। ভাইজানের পড়ার টেবিলে রাখা মোটা মোটা বইগুলো দেখে খুব ইচ্ছে করতো, অমন বই বড়ো হয়ে সেও পড়বে। মুখ ফসকে একদিন সেই কথাটা ভাইজানের সামনে যেই না বলে ফেলেছিল, অমনি একটা বিনুনিতে পড়ল টান। সারা সন্ধ্যা তাই নিয়ে ঘাড় গোঁজ করেছিল সে। ভাইজানের ঠোঁটের কোণের হাসিটিও যেন আর ফুরোচ্ছিল না। দু'ভাইবোনের কাণ্ড দেখে বাবা বলেছিলেন,

–বেশ তো। তুই যখন পড়তে চাস তখন নিশ্চয়ই পড়বি। আমার কাছে ছেলেতে মেয়েতে কোনো ভেদাভেদ নেই। তোকে আমি পড়াব।

বাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তবেই সে রাতে ভাত খেয়েছিল সে। কলেজে ভর্তির সময় মা অবশ্য একটু আপত্তি তুলেছিলেন। এত বড়ো মেয়ে কলেজে একা একা পড়তে যাবে! পাড়ার লোকে বলবে কী! তারচেয়ে বাড়িতে থেকে মাকে সাহায্য করুক আর সংসারের কাজ শিখুক। কিন্তু বাবা আর ভাইজানের জন্য সে আপত্তি ধোপে টেকেনি। সেদিন বাবার কথায় না, ভাইজানের কথায় মা রাজি হয়েছিলেন।

–আরে মা। কী যে বলো না তুমি। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে কত মেয়েরা পড়ছে। আর রাহেলা তো পড়বে আমাদের শহরের কলেজে। কে আবার কী বলবে? আর লোকের কথায় কান দিলে চলবে? তুমি অত ভেবো না তো।

বুক ফুঁড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। গেল মার্চের প্রথম সপ্তাহে ভাইজানের সাথে ওর শেষ দেখা। তখন বাড়ি এসে বেশিদিন থাকত না ভাইজান। সারাদিন মিটিং-মিছিল নিয়ে ব্যস্ত থাকত। বাড়ি ফিরলেও বাড়িতে দু'দণ্ড বসতে চাইত না। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ছেলেদের সংগঠিত করত। সেবার ঢাকা থেকে এসে বাবার সাথে নীচু গলায় কী কী সব যেন আলোচনা করছিল। না শুনলেও কথার বিষয়বস্তু ঠিকই আন্দাজ করতে পেরেছিল রাহেলা। দেশের অবস্থা ভালো নয় মোটেও। দেশজুড়ে থমথমে পরিস্থিতি। অধিবেশন ভেঙে দিয়ে ইয়াহিয়া তার দেশে ফিরে গেছে। আমাদের ন্যায্য দাবিগুলো কিছুতেই মেনে নিচ্ছে না একগুঁয়ে পশ্চিমারা। ওদের শোষণ-বঞ্চনা কাঁহাতক মুখ বুজে মেনে নেওয়া যায়? সবাই আছে এখন মুজিবের ডাকের অপেক্ষায়। ৭ তারিখ নাকি মুজিব ভাষণ দেবেন। এই ভাষণ থেকেই পাওয়া যাবে পরবর্তী নির্দেশ। ভাইজান তাই তড়িঘড়ি ঢাকা ফিরে গেলেন। ৭ই মার্চের ভাষণে মুজিব দিলেন স্বাধীনতার ডাক। পাকিস্তানি হায়েনারা ২৫শে মার্চ রাতে ঘুমন্ত ঢাকায় চালাল পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয় হলের আরো অনেক ছাত্রের সাথে সেই রাতে ভাইজানও শহিদ হলেন। এই ৯ মাস তার জীবন থেকে আরো অনেক কিছুর মতো ভাইজানকেও কেড়ে নিয়েছে। ভাইজান থাকলে কি ওর জীবনটা এমন হতো ! সে কি খুঁজে বের করত না রাহেলার খবর? অবশ্যই করত। রাহেলাকে ফিরে পেয়ে কী যে খুশি হতো বাবা- মা। ওকে জড়িয়ে ধরে কতই না আদর করত। মার কাছে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করে। মার বুকে একবার মাথা রাখতে পারলে ওর সব যন্ত্রণা দূর হয়ে যেত। এলোমেলো ভাবনাগুলো ইঁদুরের মতো মাথার আনাচেকানাচে দৌড়ে বেড়ায়। চাইলেও রাহেলা সেসব তাড়াতে পারে না।

স্কুল থেকে ফিরে আজ আর কোনো কাজে মন বসছে না। জহির ফেরেনি তখনও। ওর ফিরতে ফিরতে হয় সন্ধ্যা, নয়ত রাত। রাহেলার বিকেল আগে ছাদেই কাটত। বাড়িতে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠলে ঐ একটাই জায়গা ছিল বুক ভরে নিশ্বাস নেবার। এ ভাড়া বাসাটার ছাদেও যাবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ও একবারও যায়নি। এখন আর বাঁধা দেবার কেউ নেই। কেউ বলার নেই– এতক্ষণ ধরে ছাদে কী করিস? নাম শিগগির। তবুও কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না এখন আর। নিতান্তই যেতে হবে বলে স্কুলে যায়। সেখানেও প্রয়োজনের বাইরে কোনো কথাই বলে না কারো সাথে। কোনো সহকর্মীর সাথে তাই এতদিনেও সখ্য গড়ে ওঠেনি। সবাই ওকে স্বল্পভাষী হিসেবেই জানে। বাসায় ফিরে দুটি মানুষের একটুখানি রান্না। দ্রুতই ফুরিয়ে যায় হাতের কাজ। এরপর ঘর অন্ধকার করে একা চুপ করে বসে থাকে। অন্ধকার ঘরে বসে জহিরের ফেরার অপেক্ষা করে।

দরজার কাছে খুট করে একটা শব্দ হয়। জহির এল বুঝি। এত তাড়াতাড়ি তো সে আসে না কখনো। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে দরজা খুলে রাহেলা বোবা হয়ে যায়। এ কাকে দেখছে সে? এ যে বাবা! বাবা এখানে কী করে এলেন? বিস্ময়ে প্রথমে কথা ফোটে না ওর মুখে। সংবিৎ ফিরে পেতেই হাত ধরে বাবাকে ঘরে নিয়ে আসে।

–বাবা! তুমি এখানে কীভাবে এলে? কেমন আছো তুমি? আমার ঠিকানা পেলে কার কাছে? মাকে আনোনি? মা কেমন আছে?

আনন্দের আতিশয্যে একের পর এক প্রশ্ন রাহেলার। এবার ভালো করে তাকায় বাবার দিকে। কেমন বুড়িয়ে গেছে বাবা। চোয়াল দু'টো ভেতরে বসা। চোখের নিচে কালি। চুলেও পাক ধরেছে।

মাত্র এই ক'মাসে বাবার এমন হাল হলো!

–কিছু বলছ না কেন, বাবা?

ক্লান্ত পায়ে একটা চেয়ার টেনে বাবা বসলেন।

–তুমি বসো বাবা। আমি এক্ষুণি আসছি। রাহেলা ছুটে যায় রান্নাঘরে। ফিরে আসে এক গ্লাস শরবত হাতে। গ্লাসটা বাবার হাতে দিয়েই আবার প্রশ্নের তুবড়ি ছোটায়–

–মা'কে কেন সাথে আনলে না বাবা? কত্তদিন দেখি না মা'কে।

–আমাদের পাড়ার মোতালেব সাহেবকে মনে আছে তোর?

রাহেলা সম্মতি দিয়ে মাথা নাড়ায়।

–মোতালেব সাহেব ঢাকায় এসেছিলেন দু'দিনের জন্য। উঠেছিলেন তোরই এলাকায় এক আত্মীয়ের বাসায়। তিনি রাস্তায় তোকে দেখেছেন। ফিরে গিয়ে আমাদের বলেছেন তোর কথা।

–তাই? তা উনি আমায় ডাকলেন না কেন? যাক সে কথা। তোমাদের কত চিঠি দিয়েছি। একটারও উত্তর পাইনি। আঁচলটা আঙুলে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে রাহেলা বলে চলে, ও খোঁজ নিয়ে জেনেছে তোমরা নাকি আগের ঠিকানায় আর নেই। আমাকে অনেকবার বলেছে, তোমাদের নতুন ঠিকানা খুঁজে বের করে আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবে। ওহ্। তোমাকে তো তোমাদের জামাইয়ের কথা বলাই হয়নি। স্বাধীন হওয়ার ক'মাস পরই আমরা বিয়ে করেছি। তখন তোমাদের কোনো খোঁজই পাচ্ছিলাম না। ও খুব ভালো মানুষ, বাবা। এখন তো তুমি এসে পড়েছ। ও একটু পরই অফিস থেকে ফিরবে। আমি এই ফাঁকে ব্যাগটা গুছিয়ে ফেলি। ও এলে রাতের ট্রেনেই আমরা রওনা হয়ে যাবো। ইশ, কতদিন পর মার কাছে যাবো !

–তোকে ব্যাগ গুছাতে হবে না। আমি এখনই চলে যাবো।

–এখনই চলে যাবে? রাহেলার কণ্ঠে বিস্ময় আর অবিশ্বাস খেলা করে। ও আগে ফিরুক। আমার বেশি সময়

–বল্লুম তো। তোর ব্যাগ গোছানোর দরকার নেই।

বাবার থমথমে স্বরে রাহেলা দিশেহারা হয়ে যায়, দরকার নেই! বাবাকে এখন তার অচেনা মনে হতে থাকে।

–না নেই। তুই বেঁচে আছিস শুনে দেখতে এসেছি কথাটা সত্য কি-না।

–ঠিক আছে। বুঝলাম। এখন সবাইকে গিয়ে বলবে আমি বেঁচে আছি। তোমার জামাইকে বলব, কালই যেন অফিসে ছুটির দরখাস্ত দেয়। ছুটি পেলেই আমরা আসছি। আজই গিয়ে চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দেবে। বলবে, রাহেলা মরেনি। বেঁচে আছে।

–কী বলব? বলব যে, তুই তিন মাস পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে বন্দি ছিলি? আমাদেরও আত্মীয়স্বজন আছে। সমাজের আর দশটা লোকের সাথে আমাদের ওঠাবসা করতে হয়। রায়হান শহিদ হয়েছে। সেই দুঃখ আমরা বাবা-মা হয়ে মেনে নিয়েছি। তুই কি আমাদের দুঃখ আরো বাড়াতে চাস? এখন তোর কথা বলে কি আমরা মুখে চুনকালি লাগাবো? তুই কি তাই চাস? তুই কি চাস, তোর জন্য আমরা এই বুড়ো বয়সে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকি?

কথাগুলো একনাগাড়ে বলে বাবা হাঁপাচ্ছেন। রাহেলা দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল মূর্তি হয়ে। এত কষ্ট কি সে ঐ ক্যাম্পে পেয়েছিল? মনে হয় না তো! রাহেলা অবাক হয়ে ভাবে, সময় ও পরিস্থিতি কীভাবে মানুষকে বদলে দেয়, বাবা-মার কাছে আজ সে মৃত! অথচ এই বাবা-মাই একদিন তাকে সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে শহরে পড়তে পাঠিয়েছিলেন।

–কীসের কলঙ্ক বাবা? ওরা যে আমাকে তোমাদের চোখের সামনে ধরে নিয়ে গেল। তোমরাই তো পারনি ঐ জানোয়ারগুলোর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে। আর আজ তুমি আমার পরিচয় মুছে দিতে এসেছ? আমার অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাও না তুমি? তবে কেন এসেছিলে আমাকে দেখতে? আমি তো তোমাদের কাছে মরেই গেছি।

রাহেলার চোখ পড়ে খোলা দরজায়। জহির কখন এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে তা ওরা কেউই টের পায়নি। বাবা নীরবে বেরিয়ে গেলেন।

রাহেলা কৈফিয়ত দেবার সুরে বলে, উনি আমার বাবা। আমার খবর পেয়ে আমাকে দেখতে।

–আমি জানি। কিছু বলতে হবে না তোমাকে। আমি সবই শুনেছি।

মুহূর্তেই রাহেলার মুখ থেকে রক্ত সরে যায়। জহিরকে আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে, তুমিও কি আমাকে ভালোবাসো না? তুমি কি আমাকে করুণা করেছ, বলো? তুমিও কি মনে করো, আমি অচ্ছুৎ? রাহেলার কণ্ঠে হাহাকার।

–কী যে সব বলো তুমি, রাহেলা? আমি তো সব হারিয়ে তোমাকে পেয়েছি। একসঙ্গে বাকি জীবনটা কাটাবো বলে ঘর বেঁধেছি। তুমি কেন এই ব্যাপারটা নিয়ে এতটা ভাবো, যাতে তোমার কোনো দোষ ছিল না? আমরা তোমাদের রক্ষা করতে পারিনি সে ব্যর্থতা তো আমাদের। তুমি বাবার কথায় মন খারাপ করছ তো? ক'টা দিন যাক। উনি শান্ত হলে আমি তোমাকে ওদের কাছে নিয়ে যাবো। তখন দেখবে সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। আবার আগের মতো হয়ে যাবে সব।

জহিরের চোখে চোখ রাখে রাহেলা। সেখানে কোনোরকম ভণিতা নেই। বরং সে চোখে সরলতা, বিশ্বস্ততা আর ঘুরে দাঁড়াবার দৃঢ়তা। একদিন তার প্রতি পরম নির্ভরতায় ঘর বাঁধবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে-ই। রাহেলা তার নিজের ভুল বুঝতে পারে, নিজের মধ্যে হীনমন্যতা আর গ্লানি আশ্রয় নিয়েছিল বলে আফসোস হয় তার।

সে রাতেও রাহেলা কলপাড়ে যায়, প্রতি রাতের মতো বালতিতে পানি ভরে। কিন্তু গায়ে ঢালতে গিয়ে থেমে যায়। রাহেলা কী মুছবে? কেন মুছবে? যে পঙ্কিলতায় তার কোনো দায় নেই সেটা কীভাবে মুছবে সে? তার প্রয়োজন-ই বা কী? রাহেলা পানিপূর্ণ বালতির কাছ থেকে সরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে। অনেকদিন পর একসময় তলিয়ে যায় গভীর ঘুমে।

আশ্চর্য প্রশান্তি ছুঁয়ে যায় জহিরকেও। তার বোধ তাকে বলে দেয় অতল গর্তে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাওয়া থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে রাহেলা।

আগমন

সাঈদ তপু

তোমার আগমনে সেদিন
বিকেলে ফোটে ভোরের ফুল
নিশ্চুপ কোলাহল
হৃদয়ের আঙিনা জুড়ে
মনময়ূরী পেখম তুলে করে
ধ্রুপদী নৃত্যের নানা আয়োজন
ঝুঁটি শালিকের দল
ঠোঁটে ঠোঁট রেখে তোলে
প্রণয়ের সুর
অন্তরাগের রঙিন আভায় ভাঙে
শিশিরের লাজ
বিনিসুতোয় এমন কারুকাজ
পৃথিবী আগে দেখেনি কখনো
উর্মির দোলে ভাসেনি আগে
জীবনের সমুদ্র সফেন
গভীরে জমে ওঠে অভূতপূর্ব এক
প্রেমের আস্তরণ
পাথর প্রতীম বুকে
দল বেঁধে ছুটে আসে আশা
ভাষাহীন শয্যায় শব্দের লুটোপুটি
সময়ের ভ্রুকুটিতে নাচে
বিকেলের রোদ; অতঃপর
গহীনের বালুকাবেলায় বাঁধে ঘর
স্বপ্নের ছাউনিতে
প্রেমময়, শাশ্বত ভালোবাসা।

যেদিকে তাকাই

মুহাম্মদ ইসমাঈল

যেদিকে তাকাই
শুধু তুমি
তুমি তুমি তুমি
ও আমার মাতৃভূমি
ও আমার মা
ও আমার গাঁয়ের নদী
আমার সমস্ত প্রেম
বিরহের অনন্ত আকাশ
একমাত্র তুমি ছাড়া
কেউ আর গ্রহণ করে না।
অন্ধকার থেকে
আলোর উদ্যানে নিয়ে যাও তুমি
তুমিই আমার আশ্রয়
যেদিকে তাকাই আমি
শুধু তুমি
তুমি তুমি আর তুমি।

স্বাধীনতা তুমি

আবু তৈয়ব মুছা

স্বাধীনতা তুমি–
লাল গোলাপের একটি ফোটা ফুল,
তোমারে পেতে জীবন দিতেও
হয়নি কারো ভুল।
স্বাধীনতা তুমি–
আঁধার রাতে, জোসনামাখা আলো,
ছিনিয়ে নিতে তোমারে ওগো,
কত যে শহিদ হলো।
স্বাধীনতা তুমি–
সবুজের মাঝে,
সূর্যের রক্তিম পতাকা,
স্বাধীনতা তুমি–
পাকিস্তানের পরাজয়ের নাকে খত দেওয়া,
আগুনে পোড়ানো,
হায়েনার কুশপুত্তলিকা।
স্বাধীনতা তুমি–
ছুঁড়ে ফেলা
তেইশ বছরের শাসন,
স্বাধীনতা তুমি–
জলন্ত চিতায়
শেখ মুজিবের ভাষণ।
আর?
স্বাধীনতা তুমি–
বিশ্বের বুকে
বাংলার মানচিত্রের আসন।

স্বদেশ আমার

সাঈদ কামরুল

আমি যেখানেই যাই, যত দূরেই যাই,
প্রভাতের সুমধুর কুজনে জেগে থাকে দু'চোখ,
মিষ্টি রোদের দিগন্তে যেন মিশে যায় হৃদয়।
সবুজে শ্যামলে ঢেকে থাকে স্নেহময় মন,
খোলা প্রান্তরের রূপশ্রীর তীক্ষ্ণ নজর,
এড়াতে পারি না কোনোমতে। নরম পল্লির আস্তরে
বাঁধা ফসল, ফসলের মাঠে কৃষকের গান, ছায়া
সুনিবিড় তলে রাখালের বাঁশি ভেদ করে
আমাকে এপাশ-ওপাশ।
মধু মাসের মিষ্টি ঘ্রাণ গন্ধ ছড়ায় নাকে,
নব জলধারার অবগাহনে জুড়ায় তৃষিত বুক,
নীল আকাশের ধবল মেঘ ভাসে চোখের তারায়,
সোনাঝরা মাঠে স্বপনে দেখি কৃষকের মুখে হাসি,
কুয়াশাঘেরা পালকি নামে মায়ের উঠোন জুড়ে,
কোকিলের গান দখিনা বাতাস নাচায় তালে তালে।
আমি যেখানেই যাই, যত দূরে যাই,
দুপাশের ঢালু তীর বেয়ে বইতে থাকে
আমার হৃদয়ে মহানন্দার কুলুকুলু ধ্বনি।

মুক্তিযুদ্ধ আমার গর্ব

জসীম আল ফাহিম

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আরদালির সামনে এসে রাণুকা বালা হঠাৎ হাউমাউ কান্না জুড়ে দেয়। কান্নার ধকলে ঠিকমতো কথা বলতে পারছেন না তিনি। কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমার সব শেষ হয়ে গেছে ভাই। পাকিস্তানি মিলিটারিরা আমার সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে।

রাণুকা বালার আহাজারি শুনে কমান্ডার আরদালি বলেন, আপনার কী হয়েছে বোন? আমাকে খুলে বলুন তো সব। বলে রাণুকা বালার মুখের দিকে তিনি তাকান।

রাণুকা বালা এবার কান্না থামিয়ে বলতে থাকেন, আমার স্বামীকে ওরা খুন করেছে। আমার চোখের সামনে গুলি করে মানুষটাকে হত্যা করেছে। আমার ছেলেটা ক্লাস নাইনের ছাত্র। সেই সময় সে এসে তার বাবার লাশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন আমার ছেলেটাকেও তারা গুলি করে দেয়। আমার মেয়েটাকে নিয়ে আমি বাড়ির পেছনে তারা ফুল গাছের ঝোপের ভেতর কোনোরকম লুকিয়ে থাকি। বাপ-ভাইয়ের করুণ মৃত্যু দেখে আমার মেয়েটিও গিয়ে ওদের লাশের ওপর গড়িয়ে পড়ে। ওরা আমার এইটে পড়ুয়া মেয়েটিকে টেনেহেঁচড়ে জলপাই রঙের জিপে নিয়ে তোলে। যাবার সময় ওরা আমাদের বাড়িটাতে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায়।

আমার চোখের সামনে এমন সব ঘটনা ঘটেছে। অথচ আমি কিছুই করতে পারিনি ভাই। ওসব দেখে আমি জ্ঞান হারিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ি। যখন আমার চেতনা ফেরে–আমি কেমন যেন হতভম্বের মতো হয়ে যাই। বুঝতে পারি আমি সবকিছু হারিয়ে চিরদিনের মতো নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমি এখন কেমন করে বাঁচব ভাই? কী নিয়ে আমি দুনিয়ায় বেঁচে থাকব বলতে পারেন? আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না। সত্যি বলছি এখন আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে ভাই।

রাণুকা বালার সব কথা শুনে কমান্ডার আরদালি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, ধৈর্য ধরুন বোন। আল্লাহপাকের ওপর ভরসা রাখুন। ওদের এমন জুলুমের বিচার আল্লাহপাক ঠিকই একদিন করবেন। আমরা তো প্রতিদিনই ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছি। প্রতিদিনই কিছু–না কিছু মিলিটারিকে আমরা খতম করছি। আমরা ওদের ছাড়ব না বোন। আমরা মরণপণ লড়াই করছি।

কমান্ডার আরদালির কথা শুনে রাণুকা বালার মনের ভেতর কেমন যেন চেতনা হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বলেন, আমি প্রতিশোধ নিতে চাই ভাই। আমি নিজের হাতে স্বামী-সন্তান হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাই। আপনি কী আমাকে সাহায্য করবেন ভাই?

কমান্ডার আরদালি একটু চিন্তিত হয়ে বলেন, আমি আপনাকে কী রকম সাহায্য করতে পারি বোন?

রাণুকা বালা দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, আমি ঠিক করেছি মুক্তিযুদ্ধে যাব। মুক্তিযোদ্ধা হয়ে আমি ওই হারামিদের দাঁতভাঙা জবাব দেবো।

রাণুকা বালার কথা শুনে কমান্ডার আরদালি বলেন, আপনি কী সিরিয়াস যে, মুক্তিযুদ্ধে যাবেন?

জবাবে রাণুকা বালা বলেন, অবশ্যই আমি সিরিয়াস। এছাড়া আমার সামনে যে আর কোনো পথ খোলা নেই ভাই। মরতে হয় মরব। তবে এমনি এমনি নয়। যুদ্ধ করেই আমি মরতে চাই।

রাণুকা বালার কথা শুনে কমান্ডার আরদালি একটু ইতস্তত করে বলেন, কিন্তু বোন!

রাণুকা বালা বলেন, কোনো কিন্তু নয় ভাই। মুক্তিযুদ্ধে আমি যাবই যাব। এটা আমার পণ।

কমান্ডার আরদালি বলেন, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হওয়া খুব কঠিন কাজ রে বোন। মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার আগে শক্ত প্রশিক্ষণ নিতে হয়। অস্ত্র চালানোর ওসব প্রশিক্ষণ আপনি পারবেন বলে তো মনে হয় না।

আরদালির কথা শুনে রাণুকা বালা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। বলেন, কেন পারব না ভাই? আমি অবশ্যই পারব। আমাকে যে পারতেই হবে।

পরে আরদালি বলেন, ঠিক আছে তাহলে। কাল থেকে আপনার প্রশিক্ষণ শুরু হবে।

পরদিন রাণুকা বালা কমান্ডার আরদালির কাছে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। পাহাড় ঘেরা সীমান্তবর্তী সমতল একটি জায়গা। ওখানে অনেক গাছগাছালি। অনেক ঝোপজঙ্গল। কোথাও বা ছায়াবৃক্ষ প্যাঁচিয়ে ধরে বেয়ে উঠেছে পান আর গোলমরিচের গাছ। রাণুকা বালার সাথে আরো কয়েকজন যুবক ওখানে প্রশিক্ষণ নিতে এসেছে। সকলে মিলে সাতাশজন মুক্তিযোদ্ধা।

জায়গাটাতে বাঁশের তৈরি একটি মাচাঙ্গ পাতানো। কমান্ডার আরদালি একটি রাইফেল এনে মাচাঙ্গের ওপর রাখেন। তিনি প্রথমে সকলকে রাইফেলটির বিভিন্ন অংশের নাম শেখান। তারপর রাইফেলটির বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে খুলে রাখেন। কোন অংশের কী কাজ বিস্তারিত বলেন। কীভাবে রাইফেল ধরতে হয় তা শেখান। কীভাবে ধরে রাইফেলেরর ট্রিগার চাপলে সুন্দরভাবে গুলি ছুড়বে তাও দেখান। পরে তিনি প্রত্যেককে গুলি ছোড়ার প্রশিক্ষণ দেন। একবার। দুবার। তিনবার। এভাবে একাধিকবার গুলি ছোড়ার সুযোগ দেন। রাইফেল থেকে গুলি ছুড়তে পেরে রাণুকা বালার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কমান্ডার আরদালি নতুন মুক্তিযোদ্ধাদের এভাবে পর পর কয়েকদিন রাইফেল চালানো প্রশিক্ষণ দেন। গুলি ছোড়া রপ্ত হওয়ার পর তিনি তাদের নিশানা ঠিক করারও প্র্যাকটিস করান। দেখা যায়, সাতাশজনের এ মুক্তিযোদ্ধা দলটির প্রায় সকলেই খুব ভালো গুলি ছুড়তে পারছে। তবে রাণুকা বালার নিশানা সকলকে ছাড়িয়ে। তার নিশানা এমন হয়েছে যে, আকাশে উড়ন্ত কোনো চিলকে গুলি করে মাটিতে ফেলে দেওয়া কোনো ব্যাপারই নয়।

রাইফেল চালানো শেখার পর কমান্ডার আরদালি নতুন এ মুক্তিযোদ্ধা দলকে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণ যেদিন শেষ হয়, কমান্ডার আরদালি সকলকে উদ্দেশ্য করে জরুরি কিছু কথা বলেন। তিনি তাদের শপথবাক্য পাঠ করান। শপথবাক্যের ধরন অনেকটা এমন–'আমি শপথ করছি যে, পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে জীবনপণ যুদ্ধ করব। জননী-জন্মভূমি বাংলাদেশকে স্বাধীন না করে আমরা কিছুতেই ঘরে ফিরব না।'

শপথগ্রহণ শেষ হলে কমান্ডার আরদালি প্রত্যেকের হাতে একটি করে নতুন আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেন। বলেন, এই অস্ত্রটি জাতীয় সম্পদ। কিছুতেই এটি হাতছাড়া করা যাবে না। কখনো বুলেটের অপচয় করা যাবে না। মনে রাখতে হবে–একজন মিলিটারি খতম করার জন্য একটি বুলেটই যথেষ্ট।

সেদিনের পর থেকে রাণুকা বালা ছোটোখাটো অপারেশনে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত বাহিনীর সাথে তিনি মাঝেমধ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। যে গুলি ছুড়তে পারে, গুলি করে পাকিস্তানি মিলিটারি খতম করতে পারে সে-ই মুক্তিযোদ্ধা। সেদিক থেকে রাণুকা বালা ভালোই গুলি করতে পারেন। ইতিমধ্যে তিনি বেশ কয়েকজন মিলিটারিকে খতমও করেছেন।

সেদিন ভোর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা একটি মিলিটারি ক্যাম্প আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। অপারেশনে যাওয়ার আগে কমান্ডার আরদালি বলেন, আমরা প্রথমে মিলিটারি ক্যাম্পটি ঘিরে ফেলব। মিলিটারিরা কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমরা গ্রেনেড চার্জ করে ওদের বিপর্যস্ত করে তুলব। বিপর্যস্ত অবস্থায় মিলিটারিরা দিক-দিশা হারিয়ে ফেলবে। তখন সকলেই একযোগে গুলি করে সবকটা মিলিটারিকে ধরাসায়ী করব।

কমান্ডার আরদালির পরামর্শমতোই মুক্তিযোদ্ধারা অপারেশনে নামেন। হঠাৎ আরদালি বলেন, আচ্ছা রাণুকা বালাকে তো আমাদের সাথে দেখছি না। কোথায় গেছে সে? এতক্ষণ তো সে আমাদের সাথেই হেঁটে এসেছে। হঠাৎ সে নেই হয়ে গেছে–বিষয় কী?

বিষয়টা নিয়ে কমান্ডার আরদালি বড়ো ভাবনায় পড়ে যান। কিন্তু এ মুহূর্তে ভাবনা আসলেও তার করার কিছু নেই। আজকের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্পটি উড়িয়ে দিতে হবে। কেন্দ্রের নির্দেশ। ক্যাম্পটি উড়িয়ে দিতে না পারলে সেক্টর কমান্ডারের কড়া ধমক শুনতে হবে তাকে। কমান্ডার আরদালি কারো ধমক শোনার পাত্র নয়।

মুক্তিযোদ্ধারা পরিকল্পনামতো প্রথমে মিলিটারি ক্যাম্পটি ঘিরে ফেলে। তারপর বজ্রপাতের মতোই গ্রেনেড চার্জ শুরু করে। অতর্কিত গ্রেনেড হামলার কারণে মিলিটারিদের মনোবল ভেঙে যায়। তারা যে যার মতো এলোপাতাড়ি ছুটাছুটি করতে শুরু করে। মিলিটারিরা অবিরাম ছুটছে। দিগ্বিদিক ছুটছে। তাদের কারো হাতে রাইফেল। কেউ গুলি ছুড়ে ছুড়ে ছুটছে। কেউ আবার দৌড়ে পালাচ্ছে। মিলিটারি ক্যাম্পে এমনি একটা ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়।

এদিকে রাণুকা বালা মনে মনে ভাবেন, আমার মেয়েটা এই ক্যাম্পেই হয়ত কোথাও বন্দি হয়ে আছে। যে করে হোক তাকে আমার উদ্ধার করতেই হবে। ওকে আমার অবশ্যই বাঁচাতে হবে। এতে আমার প্রাণ যায় যাক। এই ভেবে তিনি আগেই মুক্তিযোদ্ধাদের কাউকে কিছু না বলে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন। তিনি লুকিয়ে একেবারে মিলিটারি ক্যাম্পের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেন। একযোগে গ্রেনেড হামলা শুরু হতেই তিনি ভাবেন–এটাই সুযোগ। মিলিটারিরা এখন নিজেদের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত। এই সুযোগে কোনোরকম মেয়েটিকে উদ্ধার করে আমাকে পালাতে হবে। ভেবে তিনি চুপি চুপি ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে পড়েন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি তার মেয়েটিকে খুঁজতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মেয়েটিকে খুঁজে পেয়েও যান। শুধু তার মেয়ে নয়–ওখানে আরো অনেক মেয়েকে তিনি খুঁজে পান।

ক্যাম্পের ভেতর খুপরি ঘরের মতো ছোটো একটি রুম। ওই রুমের ভেতরই মেয়েগুলোকে তারা আটকে রাখে। রুমের বাইরে থেকে খিল আঁটকানো। রাণুকা বালা খুপরি ঘরের আগল খুলে দেন। অমনি আটক মেয়েগুলো হুড়মুড় করে খুপরি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে আর কোনো কথা নেই। যে যার মতো নিরাপদ আশ্রয়ের খুঁজে ছুটতে থাকে।

মাকে চিনতে পেরে রাণুকা বালার মেয়েটি আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরে। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে সে। মেয়ের এমন কান্না দেখে ফিসফিস করে তিনি বলেন, এখন চুপ করো। এখন কোনো কান্নাকাটি নয়। কান্নাকাটির সময় এখন নয়। তার আগে চলো আমরা নিরাপদ আশ্রয়ে যাই।

বলে তিনি মেয়েটিকে সাথে নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েন। মা ও মেয়ে সরীসৃপের মতো ক্রলিং করে করে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে এগোতে থাকেন। সে সময় কোথা থেকে যেন একজন সশস্ত্র রাজাকার এসে ওদের সামনে দাঁড়ায়। আগে থেকেই হয়ত সে ক্যাম্পে ঘাপটি মেরে থেকে থাকবে। অস্ত্র তাক করে রাজাকারটি বলে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তোরা যুদ্ধ করিস, না? দাঁড়া দেখাচ্ছি খেলা। আজ তোদের দুজনকে মেরে আমি মুক্তিযুদ্ধের নিকুচি করব।

কিন্তু পরক্ষণে মুক্তিযোদ্ধা রাণুকা বালার হাতের রাইফেলটি অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে সহসা গর্জে ওঠে। সেই সঙ্গে নরাধম রাজাকারটি মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যায়। রাণুকা বালা তার মেয়েকে সাথে নিয়ে ক্রলিং করে এগোতে এগোতে বলেন, এখনো থামার সময় হয়নি, মা। আমাদের আরো সামনে এগোতে হবে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৯ই নভেম্বর ২০১৮ শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে '১৭তম এশিয়া উন্মুক্ত ফুল কন্ট্রাক্ট কারাতে প্রতিযোগিতা'য় আই, কে, ও বাংলাদেশকে ক্রেস্ট প্রদান করেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

খেলাধুলায় সাফল্যের জন্য চাই সুসমন্বিত পরিকল্পনা

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, ক্রিকেটের পাশাপাশি অন্যান্য খেলার জন্য সুসমন্বিত পরিকল্পনা নেওয়ার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি দেশের ঐতিহ্যবাহী ও সম্ভাবনাময় খেলাগুলোকে এগিয়ে নিতে সরকারের পাশাপাশি ক্রীড়ানুরাগীদের এগিয়ে আসতে হবে।

৯ই নভেম্বর মিরপুরে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে ১৭তম 'অল এশিয়া উন্মুক্ত ফুল কন্ট্রাক্ট কারাতে' প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এসব কথা উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, '২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হবে। সে সময় আমরা দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে কীভাবে দেখতে চাই, তা এখনই নির্ধারণ করতে হবে। খেলাধুলার কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে হলে একটি সুসমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিকল্প নেই'। এছাড়া মেয়েরা, যুব ফুটবলাররা ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিয়ে ইতোমধ্যে দেশের জন্য বিরল সাফল্য বয়ে এনেছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, যে খেলাগুলোতে আমাদের অপার সম্ভাবনা রয়েছে, রয়েছে সোনালি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২১শে নভেম্বর ২০১৮ 'সশস্ত্রবাহিনী দিবস' উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন–পিআইডি

ঐতিহ্য, সেগুলোকে এগিয়ে নিতে সরকারের পাশাপাশি সকল ক্রীড়ানুরাগীকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

সশস্ত্রবাহিনী দিবসে শিখা অনির্বাণে রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধা নিবেদন

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে ২১শে নভেম্বর ঢাকা সেনানিবাসে শিখা অনির্বাণের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় রাষ্ট্রপতি মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করা সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। পরে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর একটি চৌকস দল অভিবাদন প্রদান করেন এবং রাষ্ট্রপতি শিখা অনির্বাণ প্রাঙ্গণে রাখা পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। এর আগে শিখা অনির্বাণে পৌঁছলে তিন বাহিনীর প্রধানগণ এবং সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ৩রা ডিসেম্বর ২০১৮ নবম জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ভাষণের সংকলনের কপি 'বক্তৃতা সমগ্র' তুলে দেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। এসময় তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ও তথ্য সচিব আবদুল মালেক উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা সমগ্র নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন শেখ হাসিনা। দায়িত্ব পালনকালে তিনি বিভিন্ন ইস্যুতে নীতিনির্ধারণী বক্তৃতা প্রদান করেন। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মহান জাতীয় সংসদে দেওয়া তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা সমগ্র নিয়ে '৯ম জাতীয় সংসদ বক্তৃতা সমগ্র (২০০৯-২০১৩): শেখ হাসিনা'– শীর্ষক দুই খণ্ডের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ৩রা ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করা হয় এই গ্রন্থ। প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব ইহসানুল করিম এবং অতিরিক্ত প্রেস সচিব মো. নজরুল ইসলাম গ্রন্থটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন।

সংকলনটির প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম। এটির গ্রন্থনা ও সম্পাদনায় ছিলেন অতিরিক্ত প্রেস সচিব মো. নজরুল ইসলাম, সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন এবং সহযোগিতায় ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব এম এম ইমরুল কায়েস, সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত) শাওন চৌধুরী ও সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত) গুল শাহানা উর্মি। সংকলন দুটি প্রকাশ করেছেন স. ম. ইফতেখার মাহমুদ, গৌরব প্রকাশন, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা।

নবনির্মিত তোষাখানার উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই নভেম্বর বিজয় সরণিতে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের পাশে নবনির্মিত তোষাখানার উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী দেশের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে এবং দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

নবম জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া বক্তৃতা নিয়ে দুই খণ্ডে প্রকাশিত '৯ম জাতীয় সংসদ: বক্তৃতা সমগ্র'-এর সংকলন গণভবনে ৩রা ডিসেম্বর ২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। (সর্ব বামে ডিএফপি'র মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে নভেম্বর ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস্ ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো' উদ্‌বোধন শেষে পরিদর্শন করেন–পিআইডি

মাদার অব হিউম্যানিটি পদক নীতিমালার অনুমোদন লাভ

'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক নীতিমালা ২০১৮'-এর খসড়া অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। ১৯শে নভেম্বর সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ নীতিমালার অনুমোদন দেওয়া হয়। এ নীতিমালার আওতায় প্রতিবছর ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে ৫ জনকে এ পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রতিবছর ২রা জানুয়ারি সমাজকল্যাণ দিবসে এ পদক দেওয়া হবে।

চামড়াজাত পণ্য প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে নভেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো ব্লেইজ ২০১৮'- এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দেশে এদেশের অ্যাম্বাসেডর ও হাইকমিশনারদের কোন দেশে কোন পণ্যটি যেতে পারে , কোন পণ্যের মার্কেট আছে এবং কী ধরনের বিনিয়োগ বিদেশ থেকে আসতে পারে তা খুঁজে বের করা এবং উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আহ্বান জানান।

দেশব্যাপী সমবায় আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে নভেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে '৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবসের উদ্‌বোধন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর খাদ্য নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার জন্য এ আন্দোলনকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সমবায়ের ভিত্তিতে চাষাবাদ করা, কৃষিভিত্তিক গবেষণা এবং দেশে অধিক হারে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পরে ১০টি ক্যাটাগরিতে সমবায়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ২ বছরে মোট ২০ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে 'সমবায় পদক' প্রদান করেন এবং মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী।

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৫-১৬ বিতরণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা ডিসেম্বর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে 'জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৫-২০১৬' বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাজার খুঁজে পণ্য তৈরি এবং রপ্তানি বাড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উন্নয়নের সুযোগ গ্রহণ করে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে কর্মতৎপরতা আরো জোরদার করার কথা উল্লেখ করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন পণ্য ও খাতভিত্তিক সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়ের জন্য ৫৬টি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা ডিসেম্বর ২০১৮ প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত 'জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৫-১৬ বিতরণ' অনুষ্ঠানে পদক প্রদান করেন–পিআইডি

প্রতিবন্ধীদের মেধাশক্তি কাজে লাগানোর আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা ডিসেম্বর ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে '২৭তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২০তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফটোসেশনে অংশ নেন–পিআইডি

কেন্দ্রে '২৭তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং ২০তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। 'সাম্য ও অভিন্ন যাত্রায় প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়ন'–শীর্ষক প্রতিপাদ্য নিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজন করে এ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষায় তাঁর সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি প্রতিবন্ধীদের ভেতরে যে মেধাশক্তি আছে তা কাজে লাগানোর আহ্বান জানান। সরকারি চাকরিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠীসহ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করতে তাঁর সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে তিনি সফল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতায় বিভিন্নমুখী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রতিবেদনঃ সুলতানা বেগম

তথ্য মন্ত্রণালয় : বিশেষ প্রতিবেদন

মানবকল্যাণে প্রয়োজন নিরাপদ, সহজলভ্য, বাকস্বাধীন ইন্টারনেট

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন, ক্রমপ্রসারমান ডিজিটাল জগৎকে মানুষ ও সমাজের কল্যাণে কাজে লাগাতে প্রয়োজন নিরাপদ, সহজলভ্য, বাকস্বাধীন, বিশ্বাসযোগ্য ও টেকসই ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা। ৬ই নভেম্বর রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের ১৩তম বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ৬ই নভেম্বর ২০১৮ সিরডাপ মিলনায়তনে 'ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম-এর ১৩তম বার্ষিক সম্মেলন'-এ বক্তৃতা করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে নভেম্বর ২০১৮ সেনাকুঞ্জে 'সশস্ত্রবাহিনী দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন–পিআইডি

তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রসারিত ডিজিটাল সমাজের জন্য ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ নয়, ব্যবস্থাপনায় মনোযোগী হতে হবে। এজন্য ডিজিটাল বৈষম্য ঘুচিয়ে গণতন্ত্রায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

বিগ ডেটার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিগ ডেটা না জানলে আমাদের নগর পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে না। তাই এখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে বিগ ডেটা বিষয়টি অন্তর্ভুক্তি এবং এ বিষয়ে গবেষণা জোরদার করতে হবে বলে জানান তিনি। তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, মানবসমাজের উপকারেই ইন্টারনেট হবে। ক্ষতির জন্য নয়। তাই আগামী দিনের ডিজিটাল সমাজ ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে 'ইন্টারনেট প্রশাসন' এখন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। প্রাপ্যতা, সহজলভ্যতা, টেকসই, প্রবেশগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির নীতি বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই প্রয়োজন ইন্টারনেট প্রশাসনের।

মানবাধিকার ও বাকস্বাধীনতাবান্ধব ডিজিটাল সমাজ গড়ে তুলতে ইন্টারনেটের প্রশাসনকে সার্বজনীন হতে হবে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সব বয়স, লিঙ্গ ও শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে ইন্টারনেট ছড়িয়ে দেওয়ার বা এর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার কাজে রাষ্ট্রের আরো যত্নশীল হতে হবে। এক্ষেত্রে মাতৃভাষায় ইন্টারনেট চর্চার আইনগত বাধ্যবাধকতা দরকার। তাহলেই বাংলা বিষয়বস্তুর উন্নয়ন হবে।

তথ্যমন্ত্রীর সাথে লরা নিউম্যানের বৈঠক

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর সাথে বাংলাদেশে সফররত যুক্তরাষ্ট্রের কার্টার সেন্টারের গ্লোবাল একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম-এর ডিরেক্টর লরা নিউম্যান সাক্ষাৎ করেছেন। ১২ই নভেম্বর সচিবালয়ে তথ্যমন্ত্রী বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ ও এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের নানাদিক তুলে ধরেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার সরকার জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেই সাথে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন কর্মসূচির আওতায় সকল সরকারি দপ্তরের তথ্য ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

লরা নিউম্যান তথ্যের অবাধ প্রবাহের বিষয়ে সরকারের আন্তরিকতার প্রশংসা করেন এবং তথ্য জানার ক্ষেত্রে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার সফল হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তথ্যমন্ত্রী এ সময় তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ বিষয়ে নারী সাংবাদিকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে বলে জানান।

সংবাদপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের বিষয়ে আন্তরিক সরকার

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম বলেন, বর্তমান সরকার সাংবাদিকসহ সংবাদপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের বিষয়ে খুবই আন্তরিক। এজন্য সরকার বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছে। বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন সংশোধনের মাধ্যমে প্রেস শ্রমিক ও সংবাদপত্র কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করা অথবা নতুন আইন করে প্রেস শ্রমিক ও সংবাদপত্র কর্মচারীদের সহায়তা ভাতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশন ও বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব নিউজপেপার প্রেস ওয়ার্কার্স প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন তিনি। তথ্য সচিব আবদুল মালেক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, সম্প্রচার আইন ও গণমাধ্যমকর্মী চাকরি শর্তাবলি আইন প্রণয়নের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসময় নেতৃবৃন্দের উপস্থাপিত দাবি আন্তরিকভাবে বিবেচনা করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

সশস্ত্রবাহিনী দিবস

২১শে নভেম্বর: যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'সশস্ত্রবাহিনী দিবস'। দিবসটি উপলক্ষে পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মোঃ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিশ্ব সিওপিডি দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব সিওপিডি দিবস'।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২৫শে নভেম্বর ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন–পিআইডি

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত

যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হয় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)।

বিশ্ব ভেটেরানস দিবস উদযাপন

২৩শে নভেম্বর: রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের (রাওয়া) উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয় 'বিশ্ব ভেটেরানস দিবস'।

জাতীয় সমবায় দিবস

২৫শে নভেম্বর: সারাদেশে বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'জাতীয় সমবায় দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল, 'সমবায়ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি'।

জাতীয় আয়কর দিবস

৩০শে নভেম্বর: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয় জাতীয় আয়কর দিবস ২০১৮। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'আয়কর প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ধারাবাহিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ'।

বিশ্ব এইডস দিবস

১লা ডিসেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করে 'বিশ্ব এইডস দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'এইচআইভি পরীক্ষা করুন, আপনার অবস্থা জানুন'।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস

৩রা ডিসেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল, 'সাম্য ও অভিন্ন যাত্রায় প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়ন'।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ থাকায় পর্যবেক্ষণে আসছে না ইইউ আসছে যুক্তরাষ্ট্রের ১২টি দল

বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসছে ১২টি পর্যবেক্ষক দল। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে কয়েক হাজার দেশীয় পর্যবেক্ষক বাংলাদেশের এ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন। দেশটির এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে বলে আশা প্রকাশ করে এসব তথ্য জানান। জানা যায়, প্রত্যেকটি দলে দুজন করে পর্যবেক্ষক থাকবেন। এদিকে এ মুহূর্তে বাংলাদেশে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করায় পর্যবেক্ষক পাঠাবে না ইইউ। ২৫শে নভেম্বর হোটেল ওয়েস্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান বাংলাদেশে সফররত ইইউ পার্লামেন্টারি বোর্ডের প্রতিনিধিদল। এ সময় বাংলাদেশে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ইইউ পার্লামেন্টারি সদস্য হিসেবে প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেছে। বর্তমানে এখানে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক পরিবেশ রয়েছে। এই নির্বাচনে জনগণ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করবে পরবর্তী সরকার।

সমুদ্র সুশাসনে সম্পদ বৃদ্ধি বিষয়ে সম্মেলন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিটাইম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিমরাড) আয়োজিত 'টেকসই উন্নয়নের জন্য সমুদ্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯শে নভেম্বর রাজধানীর হোটেল রেডিসন ব্লু- তে। এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক। দিনব্যাপী সম্মেলনে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের মেরিটাইম বিশেষজ্ঞরা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণ এবং এর সঠিক ব্যবহার, সমুদ্র দূষণ প্রতিরোধ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আর সমুদ্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়

নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ ১৯শে নভেম্বর ২০১৮ ঢাকাস্থ হোটেল রেডিসন ব্লু- তে 'টেকসই উন্নয়নের জন্য সমুদ্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন–আইএসপিআর

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এ অনুষ্ঠানে। বিভিন্ন দেশের মেরিটাইম বিশেষজ্ঞরা সমুদ্র সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে অংশীদারী ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি এবং ভূমিভিত্তিক সম্পদ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রই ভবিষ্যৎ উন্নয়নের অন্যতম আশ্রয় বলে তারা মনে করেন।

২০২ শান্তিরক্ষী সদস্যের কঙ্গো গমন

প্রতিস্থাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর (বিএএফ) ২০২ জন সদস্য ৩০শে নভেম্বর ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো গমন করেছেন। বাসস সূত্রে জানা যায়, মিশনে ৩টি কন্টিনজেন্টের মোট ৩৫৮ জন শান্তিরক্ষী প্রতিস্থাপিত হবে। এদের মধ্যে ১০ জন নারী কর্মকর্তাও থাকবেন। কন্টিনজেন্টের বাকি সদস্যরা পর্যায়ক্রমে কঙ্গো যাবেন।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল চ্যাম্পিয়ন হলেন মোখলেসুর রহমান

নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) চ্যাম্পিয়ন মনোনীত হয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত আইজি (প্রশাসন ও অপারেশনস) মো. মোখলেসুর রহমান।

ইউএনএফপিএ বিশ্বব্যাপী ১৬টি দেশের ১৬ জনকে চ্যাম্পিয়ন মনোনীত করেছে। মোখলেসুর রহমান কর্মজীবনে জেন্ডারভিত্তিক নির্যাতন প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বহু বছর ধরে তিনি বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন রোধ ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। ২০১৫ সাল থেকে ইউএনএফপিএ-এর কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থেকে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করছেন। ইউএনএফপিএ-এর 'জেন্ডার বেইসড ভায়োলেন্স'- এর একজন পরামর্শক তিনি। তাঁর পরামর্শে দেশের ১৫টি থানায় ইউএনএফপিএ-এর সহায়তায় পাইলট প্রকল্প 'নারী সহায়তা ডেস্ক' স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের স্বাস্থ্যকর দেশের তালিকায় ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে

বিশ্বের স্বাস্থ্যকর দেশের তালিকায় ১০০ নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশ। এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে সিঙ্গাপুর। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান লেগাটাম ইনস্টিটিউটের 'দ্য লেগাটাম প্রসপারেটি ইনডেক্স ২০১৮' এই তথ্য তুলে ধরে। বিশ্বের ১৪৯ দেশ নিয়ে স্বাস্থ্যের পাশাপাশি আরো কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় সম্মিলিত তালিকা করা হয়েছে। বিবেচনায় নেওয়া খাতগুলো হলো– অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যবসায়ের পরিবেশ, শাসনব্যবস্থা, শিক্ষা, নিরাপত্তা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সামাজিক মূলধন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ। এই কয়েকটি খাতের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে নিরাপত্তা খাতে। এখানে বাংলাদেশের অবস্থান ৬১ নম্বরে। এছাড়া অর্থনৈতিক খাতে ৮৫, ব্যবসার পরিবেশে ১২৩, শাসনব্যবস্থায় ৮৯, শিক্ষায় ১১১, ব্যক্তি স্বাধীনতায় ১০১, সামাজিক মূলধনে ৯৭ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে ১৩৫ নম্বরে অবস্থান করছে। সব মিলিয়ে তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯। সম্মিলিত তালিকায় ভারতের অবস্থান ৯৪ হলেও স্বাস্থ্যে তাদের অবস্থান ১০৯-এ। অন্যদিকে পাকিস্তানের সম্মিলিত অবস্থান ১৩৬ এবং স্বাস্থ্যে ১২২ নম্বরে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

ধইঞ্চার জীবন নকশা উন্মোচন

প্রাকৃতিক সবুজ সার হিসেবে পরিচিত ধইঞ্চার জীবন নকশা উন্মোচন করেছেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণার সঙ্গে জড়িত বিজ্ঞানীরা ধইঞ্চার জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করে এর জিনগুলো শনাক্তে সক্ষম হয়েছেন। এখন মাটির সবুজ সার ও বন্ধু হিসেবে পরিচিত ধইঞ্চার গুণগতমান ও বিপুল হারে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে। মাটির উর্বরা শক্তি বাড়াতে উদ্ভাবন করা যাবে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও প্রয়োজন অনুযায়ী ধইঞ্চার নতুন জাত। কমবে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতিকর রাসায়নিক সারের ব্যবহার। ধইঞ্চার শিকড় ও কাণ্ডে এক ধরনের নডিউল বা গুটি তৈরি হয় যাতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া বায়ু মণ্ডলের নাইট্রোজেন সঞ্চয়পূর্বক গাছকে সরবরাহ করে। এখন ধইঞ্চার মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে উচ্চ প্রযুক্তির কৃষি গবেষণাকে জোরদার করতে। জিনোম গবেষণায় সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একটি নতুন কৃষি বিপ্লবের সূচনা করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে ধইঞ্চার জিনগুলো এবং সম্পূর্ণ জিনোম বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন (এনসিবিআই) থেকে নাম্বারিং করা হয়েছে।

এসে গেল বিমানের দ্বিতীয় ড্রিমলাইনার 'হংস বলাকা'

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সংবলিত ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার 'হংস বলাকা' যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১লা ডিসেম্বর শনিবার রাত ১১টা ৪০ মিনিটে পৌঁছেছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।

দেশের পতাকাবাহী এয়ারলাইনসের আরেকটি ড্রিমলাইনার ফ্লাইট বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর আগে ১৯শে আগস্ট প্রথম ড্রিমলাইনার 'আকাশবীণা' ঢাকায় আসে। ড্রিমলাইনার দ্বিতীয় বিমানটির নাম দেওয়া হয়েছে 'হংস বলাকা'। এ বিমানটি বাংলাদেশে পৌঁছানোর পর দেশের বিমানবহরে উড়োজাহাজের সংখ্যা হলো ১৫টি। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ১০ই ডিসেম্বর থেকে ড্রিমলাইনার আকাশে উড়বে। ড্রিমলাইনার ঘণ্টায় ৬৫০ কিলোমিটার বেগে উড়তে সক্ষম। বিমানটি নিয়ন্ত্রিত হবে ইলেকট্রিক ফ্লাইট সিস্টেমে। কম্পোজিট ম্যাটারিয়াল দিয়ে তৈরি হওয়ায় বিমান ওজনে হালকা। ভূমি থেকে বিমানটির উচ্চতা ৫৬ ফুট।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই ডিসেম্বর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোয়িং ৭৮৭-৮ মডেলের ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ পরিদর্শন করেন–পিআইডি

ইভিএমে ভোট ৬ আসনে

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ৬টি আসনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোট গ্রহণ হবে। আসনগুলো হলো: ঢাকা-৬, ঢাকা-১৩, চট্টগ্রাম-৯, খুলনা-২, রংপুর-৩ ও সাতক্ষীরা-২। ২৬শে নভেম্বর নির্বাচন কমিশন ভবনে লটারির মাধ্যমে এই ছয়টি আসন নির্ধারণ করা হয়। ইভিএমে ভোট দিতে একজন ভোটারকে শনাক্ত করে তার ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে সর্বোচ্চ এক মিনিট ৩০ সেকেন্ড সময় লাগে। এতে প্রতি কক্ষে ঘণ্টায় গড়ে ৪০-৫০ জন ভোট দিতে পারে।

কমিউনিটি ক্লিনিকে মিলছে বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ওষুধ

স্বাস্থ্যসেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ১৯৯৬ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করে। সেখানে গ্রামের অসহায় নারী ও শিশুসহ বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও ওষুধ নিয়েছেন অনেক মানুষ। এখনো প্রতিদিন লাখ লাখ মানুষ সেখানে চিকিৎসা পাচ্ছেন- যেখানে মিলছে বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ওষুধ। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিক এখন বিশ্বের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিওএইচও) ৭১তম সম্মেলনেও কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রশংসা করেছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক ড. তেদ্রোস আধানম গেব্রিয়েসাস। তিনি বলেন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ৮৫ শতাংশ কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবায় সন্তুষ্ট।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

প্রথমবারের মতো অনলাইনে ৩৯ মনোনয়নপত্র জমা

প্রথমবারের মতো একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার বিধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল নির্বাচন কমিশন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৩৯ জন প্রার্থী অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ২৮শে নভেম্বর বুধবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত সারাদেশের রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন। ৩০০টি সংসদীয় আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ৩০৬৫ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে অনলাইনে জমা দিয়েছেন ৩৯ প্রার্থী।

রাজধানীর তেজগাঁও নির্বাচন ভবনের মিডিয়া সেন্টারে নির্বাচন কমিশন সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ প্রেস বিফ্রিংয়ে এসব তথ্য জানান।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' ১২ই ডিসেম্বর

১২ই ডিসেম্বরকে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস'-এর পরিবর্তে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপনের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এখন থেকে দিনটি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হবে।

২৬শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদ সভা শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূইয়া এ তথ্য জানান। এর আগে ২০১৭ সালের ২৭শে নভেম্বর মন্ত্রিসভা ১২ই ডিসেম্বরকে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, ২০০৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা ঘোষণা করেছিল। সেই হিসেবে এই দিনটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কীভাবে চেনা যাবে 'ফেক-নিউজ'

মুঠোফোন আর সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে ভুয়া খবর বা ফেক নিউজ ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি এখন নতুন শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেকোনো আলোচিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে বস্তুনিষ্ঠ খবরের মাঝে দুই একটা ভুয়া খবর ভাইরাল হওয়া এখন আর নতুন কিছু নয়।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা গণমাধ্যমগুলোয় এই ভুয়া খবর ঠেকানো এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে ১৬ই নভেম্বর ঢাকার হোটেল আমারিতে 'বাংলাদেশের নির্বাচনে ভুয়া খবর প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে গুজব ঠেকাতে সরকার এরই মধ্যে 'গুজব শনাক্তকরণ সেল' গঠন করলেও ভুয়া খবর ঠেকাতে শুধু আইনের কড়াকড়ি যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এক্ষেত্রে তারা সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহারে সচেতনতা ও দায়িত্বশীল আচরণের ওপর জোর দেন। সেমিনারে গণমাধ্যমকর্মীদের পাশাপাশি এতে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরাও।

সেমিনারের শুরুতে বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভুয়া খবর এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা এবং কীভাবে এ ধরনের খবর শনাক্ত করা যায় এ বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়।

সেমিনারে জানানো হয়, মূলত চারটি উপায়ে এই ভুয়া খবরগুলো ছড়িয়ে থাকে।

১. ফেসবুক ২. ইউটিউব ৩. ভুয়া ওয়েবসাইট ৪. গণমাধ্যম।

আর এসব মাধ্যমে প্রকাশিত ভুয়া খবরগুলো ইউজারদের লাইক, কমেন্ট ও শেয়ারের কারণে ভাইরাল হয়ে যায়। আবার অনেক গণমাধ্যম এসব সামাজিক মাধ্যমের তথ্য যাচাই-বাছাই না করেই খবর প্রকাশ করে।

ভুয়া খবর শনাক্তের উপায় সম্পর্কে সেমিনারে বলা হয়েছে, ১. কমনসেন্স ব্যবহার ২. খবরের কন্টেন্ট বা তথ্য নিয়ে সন্দেহ হলে, প্রতিটি যাচাই করা ৩. অনলাইনে সার্চ দিয়ে যাচাই-বাছাই করে দেখা ৪. খবরের তথ্যসূত্র বা ছবি/ভিডিওর উৎস বের করা ৫. খবরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি স্কুলে ভর্তি নীতিমালা প্রকাশ

ঢাকা মহানগরীর স্কুলের পার্শ্ববর্তী এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০ শতাংশ এলাকা কোটা সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দিয়ে 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা ২০১৮' প্রণয়ন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২৫শে নভেম্বর এ নীতিমালাটি প্রকাশ করা হয়। অবশিষ্ট ৬০ শতাংশ আসন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে মোট আসনের ১০ শতাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা সন্তানদের ছেলেমেয়ের জন্য ৫ শতাংশ, প্রতিবন্ধীদের জন্য ২ শতাংশ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য আরো ২ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করার কথা নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে।

২০১৯ শিক্ষাবর্ষে সব মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা সদরের সব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নীতিমালায়। উপজেলা সদরেও অনলাইন পদ্ধতিতে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক। তবে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণে অনলাইনে কার্যক্রম চালানো না গেলে কেবল উপজেলার ক্ষেত্রে ম্যানুয়ালি করা যাবে। এছাড়া প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবশ্যিকভাবে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে হবে। পাশাপাশি শূন্য আসনের সমানসংখ্যক অপেক্ষমাণ তালিকাও প্রস্তুত রাখতে হবে। ভর্তি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে নির্বাচিত শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তি করা যাবে।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

বিদেশ যাচ্ছে শিঙের তৈরি বোতাম

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে গরু ও মহিষের শিং দিয়ে তৈরি বোতাম রপ্তানি করা হচ্ছে জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, হংকং, চীন ও স্পেনসহ বিভিন্ন উন্নত দেশে। এসব বোতাম দামে বেশি হলেও আকর্ষণীয় বাহারি ডিজাইনের আর টেকসই হওয়ায় দেশ-বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে। এ ব্যবসার মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকার মতো বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।

বোতাম রপ্তানি করে সৈয়দপুরে এগ্নো রিসোর্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রপ্তানিকারক হিসেবে ১৯৯০ এবং ১৯৯১ সালে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি-রপ্তানি) মনোনীত হন। শহর ও গ্রাম এলাকায় গরু ও মহিষ জবাইয়ের পর শিং ও হাড় সাধারণত ফেলে দেওয়া হয়। সেই শিং ও হাড় সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাত করে উন্নতমানের রঙিন বোতাম তৈরি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। যা শার্ট, প্যান্ট, কোট, সাফারি ও স্টাইলিশ বিভিন্ন পোশাকে ব্যবহারের জন্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে এসব বোতামের।

দেশেই তৈরি হচ্ছে সুইচবোর্ড

জাহাজ নির্মাণের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম 'সুইচবোর্ড'। এটি দিয়ে জাহাজের যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ হয়। এতদিন বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো এই সুইচবোর্ড। এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে। এই সুইচবোর্ড তৈরির পথ দেখিয়েছেন একদল দক্ষ প্রকৌশলী। তারা কর্ণফুলীর পাড়ে গড়ে তুলেছেন 'ওশেন ইলেকট্রিক্যাল লিমিটেড' নামে একটি প্রতিষ্ঠান।

সুইচবোর্ড বলতে শুধু ইস্পাতের বড়ো বাক্সে সাজানো বৈদ্যুতিক তার ও সরঞ্জামের কথা ভাবলে ভুল হবে। জাহাজের সব সরঞ্জামের মতো সুইচবোর্ড তৈরির পদে পদে বৈশ্বিক মান বজায় রাখতে হয়। এটি নির্মাণের আগে নকশা করে সেটি অনুমোদন নিতে হয় আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে। সেই নকশা অনুযায়ী তা নির্মাণ হয়েছে কি-না, তা সরেজমিনে পরীক্ষা করে নিশ্চিত করেন আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। জাহাজে বসানোর পর চূড়ান্ত অনুমোদন নিতে হয়। প্রতিটি ধাপে মান নিশ্চিতের পরই মিলে চূড়ান্ত সনদ।

২০১৩ সালের মার্চে প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানের ৪৫ জন দক্ষ কর্মীবাহিনী নিয়ে কোম্পানিটির যাত্রা শুরু। ব্যাংকের ঋণ ছাড়াই তারা ১২ জন ৬০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেন। ক্রয়াদেশ দেওয়ার দেড়-দুই মাসের মধ্যে সুইচবোর্ড পাচ্ছে জাহাজ নির্মাণ কারখানাগুলো। খরচও পড়ছে আমদানির চেয়ে গড়ে ২৫-৩০ শতাংশ কম। এখন দেশি-বিদেশি ১৪টি জাহাজ নির্মাণ কারখানা তাদের কাছ থেকে সুইচবোর্ড নিচ্ছে। সাতটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান তাদের নির্মিত সুইচবোর্ডে মান সনদ দিয়েছে। দেশের পাশাপাশি ভারত ও সিঙ্গাপুরের ক্রেতাদের কাছে তারা সুইচবোর্ড রপ্তানি করছেন।

কর আদায়ে রেকর্ড

এবারের কর মেলায় রেকর্ড পরিমাণ কর আদায় হয়েছে। সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত কর মেলা থেকে এবার প্রায় ২ হাজার ৪৬৯ কোটি টাকা আদায় হয়েছে, যা গতবারের চেয়ে ২৫২ কোটি টাকা বেশি। গতবার কর মেলা থেকে ২ হাজার ২১৭ কোটি টাকা আদায় হয়েছিল।

এনবিআর-এর তথ্য অনুযায়ী এবার বার্ষিক আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন জমা পড়েছে ৪ লাখ ৮৭ হাজার ৫৭৩টি। গতবার জমা পড়েছিল ৩ লাখ ৩৫ হাজার ৪৮৭টি। সেই হিসাবে রিটার্ন জমায়ও রেকর্ড হয়েছে। পাশাপাশি নতুন করদাতা ও দর্শনার্থীর সংখ্যার দিক থেকেও রেকর্ড হয়েছে এবারের মেলায়। এবার নতুন ইলেকট্রিক কর শনাক্তকরণ নম্বর (ইটিআইএন) নিয়েছেন ৩৯ হাজার ৭৪৩ জন। গতবার সব মিলিয়ে নতুন টিআইএন নিয়েছিলেন ২৯ হাজার ২৫৪ জন। এবার সব মিলিয়ে করসংক্রান্ত সেবা নিয়েছেন ১৬ লাখ ৩৫৬ হাজার ২৬৬ জন।

আয়কর মেলা-২০১৮

দেশে ২০১০ সাল থেকে কর মেলা আয়োজন শুরু করে এনবিআর। এরপর প্রতিবছর মেলার কলেবর যেমন বেড়েছে; তেমনি কর আদায়ে রিটার্ন জমাও বেড়েছে ধারাবাহিকভাবে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় ৪ ধাপ এগিয়ে শেখ হাসিনা

বিশ্বের ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকায় ২৬তম অবস্থানে ওঠে এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাময়িকী *ফোর্বস* ৪ঠা ডিসেম্বর এই তালিকা প্রকাশ করে। *ফোর্বসের* গত বছরের এই তালিকায় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ৩০তম স্থানে, ২০১৬ সালে ছিলেন ৩৬তম অবস্থানে এবং ২০১৫ সালে ছিলেন ৫৯তম অবস্থানে।

শেখ হাসিনাকে *ফোর্বসের* তালিকায় স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে '*ফোর্বস*' লিখেছে, ২০১৭ সালে শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও তাদের জন্য বাংলাদেশের দুই হাজার একর জমি বরাদ্দ দিয়েছেন। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে প্রাণে বাঁচতে এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এছাড়া 'বাংলাদেশ স্থায়ীভাবে রোহিঙ্গাদের বোঝা মাথায় নেবে না'– এলক্ষ্যে রোহিঙ্গাদের শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসনে কাজ করে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা।

সেরা অনুপ্রেরণাদায়ী ও প্রভাবশালীর তালিকায় সীমা রাণী

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম *বিবিসি*'র প্রকাশ করা বিশ্বের ১০০ অনুপ্রেরণাদায়ী ও প্রভাবশালী নারীর তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের নেত্রকোনার সীমা রাণী সরকার। তালিকায় ৮১তম অবস্থানে রয়েছেন তিনি। ১৯শে নভেম্বর এ বছরের তালিকা প্রকাশ করে *বিবিসি*। বিশ্বের ৬০টি দেশের ১৫ থেকে ৯৪ বছর বয়সি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রেরণাদায়ী ও প্রভাবশালী নারীদের নিয়ে এ তালিকা করা হয়।

২১শে সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার দিন শারীরিক প্রতিবন্ধী ছেলে হৃদয় সরকারকে কোলে করে সীমা রাণী নিয়ে যাচ্ছিলেন পরীক্ষার হলে। সে ছবি মিডিয়ার কল্যাণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সাড়া পড়ে। নজরে আসে *বিবিসি*'র। শুধু সেদিন নয়, বহু বছর ধরে এই কীর্তিময়ী মা এইভাবে কোলে করে স্কুল-কলেজের গণ্ডি পার করিয়েছেন ছেলেকে। উল্লেখ্য, বিবিসি প্রতিবছর বিশ্বের অনুপ্রেরণাদায়ী ও প্রভাবশালী ১০০ নারীর তালিকা প্রকাশ করে।

হ্যাশট্যাগ মি টু আন্দোলন

হ্যাশট্যাগ মি টু আন্দোলন পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ ছাড়িয়ে ভারত হয়ে এখন বাংলাদেশে। যৌন নিপীড়কের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য হ্যাশট্যাগ মি টু আন্দোলন। এটি কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে নয়। ঘরে-বাইরে শিশু ও নারীর নিরাপদ বিচরণক্ষেত্র তৈরির জন্যই এ আন্দোলন। ১৬ই নভেম্বর রাজধানীর প্রেসক্লাবের সামনে 'যৌন নিপীড়নকে না বলুন, নিপীড়কদের বয়কট করুন' স্লোগানে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে এসব কথা বলা হয়। এছাড়া ২২শে নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে 'বাংলাদেশে মি টু আন্দোলন, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনাসভায় বক্তারা হ্যাশট্যাগ মি টু আন্দোলনে সামাজিক শক্তি রাখতে হবে, আন্দোলনকে ফ্যাশন হিসেবে না নিয়ে একে কাঠামোগতভাবে এগিয়ে নিতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন।

আলোচনাসভা থেকে জানানো হয়, এখন পর্যন্ত নয়জন নারী নিজেদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া যৌন হয়রানির ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সারাবিশ্বে হ্যাশট্যাগ মি টু হিসেবে পরিচিতি পেয়ে এ আন্দোলন বাংলাদেশে আসার পর তারা মুখ খোলার সাহস পেয়েছেন।

দেশে নারী সাংবাদিকদের পরিবেশ সন্তোষজনক

বাংলাদেশে নারী সাংবাদিকদের কর্মপরিবেশ সন্তোষজনক বলে উল্লেখ করা হয়েছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান *আর্টিকেল ১৯* প্রণীত একটি জরিপ প্রতিবেদনে। ২২শে নভেম্বর রাজধানীর এক হোটেলে নারী সাংবাদিকদের সুরক্ষা বিষয়ক এক পরামর্শসভায় এই জরিপ প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়।

প্রথম আলো, *কালের কণ্ঠ*, *ঢাকা ট্রিবিউন*, *একুশে টিভি*, *ডিবিসি* ও *বিডিনিউজ ২৪*-এর ৪৬ জন নারী সাংবাদিকের মতামতের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। যেসব প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে। নারী সাংবাদিকদের জন্য রাতে পরিবহণ সুবিধা, মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করা, অসুস্থতার সময় বাড়ি থেকে অনলাইনে কাজ করার সুযোগ, আলাদা বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা, গ্রুপ বিমা ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালিত

নারীর কথা শুনবে বিশ্ব, কমলা রঙে নতুন দৃশ্য- স্লোগান নিয়ে দেশে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ (২৫শে নভেম্বর-১০ই ডিসেম্বর)। বিভিন্ন সংগঠন প্রতিদিন নানা কর্মসূচির মাধ্যমে এ পক্ষ পালন করেছে। শেষ দিন অর্থাৎ ১০ই ডিসেম্বর পালিত হয় মানবাধিকার দিবস। ২৫শে নভেম্বর সেগুনবাগিচার সুফিয়া কামাল ভবনে 'ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' স্লোগান নিয়ে মহিলা পরিষদ আয়োজন করে এক সংবাদ সম্মেলনের। অনুষ্ঠানে মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম বলেন, পরিবারের দায়িত্ব নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা। এক্ষেত্রে তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে।

বগুড়া-৫ আসনে প্রথম নারী প্রার্থী

এবারের সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-৫ আসন থেকে প্রথমবারের মতো একজন নারী মনোয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন তাহমিনা জামান হিমিকা। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। এর আগে এ আসন থেকে কোনো নারী প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেনি।

প্রথম নারী সেনাপ্রধান

স্লোভেনিয়া এক নারীকে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। ২৮শে নভেম্বর ৫৫ বছর বয়সি মেজর জেনারেল অ্যালেঙ্কা এরম্যাঙ্ক এ পদে নিয়োগ পান। ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোতে এই প্রথম কোনো নারী সেনাপ্রধান হলেন।

তারামন বিবি (১৯৫৭-২০১৮)

বিদায় বীরপ্রতীক তারামন বিবি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন নারী মুক্তিযোদ্ধা বীরপ্রতীক তারামন বিবি আর নেই। ১লা ডিসেম্বর কুড়িগ্রামের রাজীবপুর উপজেলার শংকর মাধবপুর গ্রামে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি ফুসফুস, ডায়াবেটিস ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে তাঁর পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। এসময় মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ বিভিন্ন সংগঠন ও সর্বস্তরের জনগণ তাঁকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

তারামন বিবির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী ও বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ।

স্বাধীনতা যুদ্ধে তারামন বিবির সাহসিকতার জন্য ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার তাঁকে 'বীর প্রতীক' খেতাব প্রদান করে। ১৯৭৩ সালের সরকারি গেজেট অনুযায়ী তাঁর বীরত্বভূষণ নম্বর ৩৯৪। গেজেটে নাম ছিল মোছাম্মৎ তারামন বেগম (যদিও তিনি তারামন বিবি নামেই পরিচিত)।

তারামন বিবি ১৯৫৭ সালে কুড়িগ্রাম জেলার রাজীবপুর উপজেলার শংকর মাধবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আবদুস সোবহান ও মায়ের নাম কুলসুম বিবি। স্বামী আবদুল মজিদ। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে। ১৯৭১ সালের প্রথমদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না, অস্ত্র লুকিয়ে রাখা ও খবর সংগ্রহের কাজ করতেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৩ কি ১৪। পরে অস্ত্র চালনা শেখেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের ১১ নম্বর সেক্টরে জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছেন অনেক সম্মুখযুদ্ধে। এমন দুঃসাহসী নারী মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে জাতি গভীর শোকাহত, তাঁর প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সচিত্র বাংলাদেশ প্রতিবেদক

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

রেকর্ড পরিমাণ ফল উৎপাদিত

ফল উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের এক নম্বরে। চলতি বছরে দেশে উৎপাদিত হয়েছে সর্বোচ্চ পরিমাণ ফল, প্রায় ১ কোটি ২১ লাখ মেট্রিক টন। খুব বেশি দিন আগেও বাঙালির খাদ্য তালিকায় ছিল না প্রতিদিনের অনিবার্য পুষ্টি উপাদান হিসেবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফল। শহর বা গ্রামে বড়ো ফলের বাজারও তেমন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে শহর থেকে শুরু করে পাড়ায় পাড়ায়, এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ের বাজারেও ফল বিপণনের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

বর্তমান সরকারের সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত কর্মপ্রয়াস, পরিশ্রমী কৃষক, নার্সারি মালিক, কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষি সম্প্রসারণকর্মীদের সমন্বিত চেষ্টার ফলে বাংলাদেশে আজ এত বিপুল পরিমাণ ফল উৎপাদন ও বিপণন করা সম্ভব হচ্ছে। আমাদের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ৩৪ প্রজাতির ফলের ৮১টি এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জার্মপ্লাজম সেন্টার ২৫ প্রজাতির ফলের ৮৪টি উচ্চ ফলনশীল জাতসহ এসব ফলের দ্রুত প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি এবং প্রায় ১২ হাজার নার্সারি মালিকের এক শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ফল উৎপাদন বৃদ্ধির পেছনে মৌলিক অবদান রেখে চলেছে। পাশাপাশি উদ্ভাবিত হয়েছে বিদেশি ফল দেশে সফলভাবে চাষ করার প্রযুক্তি। সব মিলিয়ে ফল এখন বাংলাদেশের অন্যতম পুষ্টিসমৃদ্ধ বাণিজ্যিক কৃষি পণ্যে পরিণত হয়েছে।

স্থাপন করা হচ্ছে কৃষক সেবাকেন্দ্র

কৃষকরা এখন হাতের নাগালে পাবেন সব ধরনের কৃষি সেবা। ফসল কিংবা গবাদিপশুর রোগবালাই নিয়ে কৃষকের উৎকণ্ঠার দিন শেষ হতে যাচ্ছে। সরকার কৃষি কাজে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষকদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে দেশের বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রত্যন্ত এলাকায় স্থাপন করছে 'কৃষক সেবাকেন্দ্র'। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবাকেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর (পাইলট) প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ২১টি জেলার ২৪টি উপজেলার ২৪টি ইউনিয়নে এ ধরনের কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ২০টি ইউনিয়নে আরো ২০টি 'কৃষক সেবাকেন্দ্র' নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

'কৃষক সেবাকেন্দ্র' ইউনিয়নে 'কৃষক সেবার ওয়ান স্টপ সেন্টার' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। যার ফলে কৃষকের জন্য সহজলভ্য হবে

আধুনিক কৃষি তথ্যসেবা। রোগবালাইয়ের আক্রমণ থেকে কীভাবে ক্ষেতের ফসল রক্ষা করা যাবে বা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো যাবে–এমন পরামর্শের সাথে এ সেবাকেন্দ্র থেকে কৃষকরা পাবেন কৃষি বিষয়ে নানা প্রশিক্ষণ। শুধু তাই নয়, কৃষক সেবাকেন্দ্র থেকে দেওয়া হবে সরকারি প্রণোদনার সার ও উন্নত মানের বীজ। সেবাকেন্দ্রগুলোতে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক অবস্থানের জন্য পারিবারিক আবাসন সুবিধা রাখা হয়েছে।

বৃষ্টির পানি সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের সুবিধা, ফসল সংগ্রহোত্তর নিরাপদ বাজারজাতকরণ কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ সুবিধা এবং কৃষি তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণের জন্য কম্পিউটার, প্রজেক্টর, ইন্টারনেট, ফটোকপিয়ার, স্ক্যানারসহ আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ইউনিয়নের কৃষির ডাটাবেজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কৃষক সেবাকেন্দ্র। পাশাপাশি আধুনিক ও উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তির এবং স্থানীয় জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের জন্য মাতৃবাগান স্থাপন এবং মিনি নার্সারি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাতৃবাগান থেকে বছরব্যাপী চারা বা কলম উৎপাদন ও হাতেকলমে প্রশিক্ষণের সুবিধা রাখা হয়েছে কৃষক সেবাকেন্দ্র ও সংলগ্ন খালি জমিতে। জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, শস্য বহুমুখীকরণ, নতুন নতুন কৃষিপ্রযুক্তি কৃষকদের ঘরে পৌঁছে দিতে 'কৃষক সেবাকেন্দ্র' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছিটানো হবে মশার ওষুধ

ফোন করলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মশার ওষুধ ছিটিয়ে আসবেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) কর্মীরা। ২রা ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সামনে সপ্তাহব্যাপী 'স্পেশাল ক্রাশ প্রোগ্রাম'-এর উদ্‌বোধন করার সময় মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন এ ঘোষণা দেন।

ডিএসসিসি থেকে জানানো হয়, নগরবাসীকে মশার উপদ্রব থেকে বাঁচাতে সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির বাইরেও নিয়মিত কার্যক্রম চলছে। ফোনে মশা নিয়ন্ত্রণের সেবা পেতে হলে ডিএসসিসি'র কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নম্বর ৯৫৫৬০১৪-এ যোগাযোগ করতে হবে। এছাড়াও ডিএসসিসি'র এক নম্বর অঞ্চলের নির্বাহী কর্মকর্তা ০১৭১২ ৯৪৭৩৭৬, দুই নম্বর অঞ্চলের নির্বাহী কর্মকর্তা ০১৭১৬ ০০৮৮৩৮ এবং তিন নম্বর অঞ্চলের নির্বাহী কর্মকর্তার ০১৭১২ ২৬৯২৯২ নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে।

এ কার্যক্রমের আওতায় পাঁচটি অঞ্চলে একযোগে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই কয়েকদিন ডিএসসিসি'র ৫৭টি ওয়ার্ডে ৩৬৭ জন মশক নিধন কর্মী কাজ করবেন। এ কাজে ৩২৪টি হস্তচালিত মেশিন, ২৪৭টি ফগার মেশিন এবং ২০টি হুইল ব্যারো মেশিন ব্যবহার করা হবে।

মায়ের কোলে চড়ে আসা অদম্য হৃদয়কে বৃত্তি প্রদান

মায়ের কোলে চড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা অদম্য মেধাবী হৃদয় সরকারকে হুইল চেয়ার ও বৃত্তি সহায়তা দিয়েছে সমাজসেবা অধিদফতর। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে ৩রা ডিসেম্বর নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক হৃদয়ের হাতে এসব সহায়তা তুলে দেন।

সমাজসেবা অধিদফতর থেকে জানানো হয়, হৃদয়কে সমাজসেবা

মায়ের সঙ্গে অদম্য মেধাবী হৃদয় সরকার

অধিদফতরের জেলা অফিসের পক্ষ থেকে ব্যাটারিচালিত হুইল চেয়ার এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র থেকে ১৪ হাজার ৭শ টাকার চেক প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে হৃদয় ছাড়াও আরো ১১ জনকে হুইল চেয়ার এবং ৩৪ জনকে বৃত্তির টাকা দেওয়া হয়।

তৃতীয় লিঙ্গের জন্য ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

তৃতীয় লিঙ্গের দুই ব্যক্তিকে ভারত নিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হেয়ার এক্সপার্ট জাবেদ হাবিবের তত্ত্বাবধানে 'হেয়ার ফ্যাশন' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। দেশে ফিরে উত্তরণ ফাউন্ডেশনের পরিচালিত বিভিন্ন পারলার, দেশ-বিদেশে জাবেদ হাবিব পরিচালিত স্যালুন ছাড়াও অন্যান্য পার্লারে কাজ করার সুযোগ পাবেন তারা। এছাড়াও তারা তৃতীয় লিঙ্গের অন্য নাগরিকদের সেবা প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। আর ব্যতিক্রমধর্মী এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের 'উত্তরণ ফাউন্ডেশন' ও ভারতের 'হাবিব ফাউন্ডেশন'। গত ২৪শে অক্টোবর দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ বিষয়ে চুক্তি সম্পন্ন হয়।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে কপ-২৪ সম্মেলন শুরু

জলবায়ু ইস্যুতে পোল্যান্ডের কাটোইস শহরে ২রা ডিসেম্বর শুরু হয়েছে কপ (কনফারেন্স অব পার্টিস)-২৪ সম্মেলন। চলবে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ২০০ দেশ সম্মেলনে যোগ দিয়েছে।

সম্মেলনে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্ব হুমকির মুখে পড়েছে। একে বাঁচাতে হলে এখনই জরুরিভিত্তিতে উদ্যোগ নিতে হবে।

তাঁরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তাঁরা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে চরম বিপর্যয়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েছে পৃথিবী। ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তির পর এবারের সম্মেলনটি জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বিবৃতিতে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি মেনে চলার জন্য সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। এই চুক্তির মূল কথা ছিল– বৈশ্বিক

তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত রাখার জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিন হাউস গ্যাস নিরসণের মাত্রা ৪৫ শতাংশের মধ্যে কমিয়ে আনতে হবে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, কার্বন নিরসরণের মাত্রা গত ৪ বছরে তুলনামূলক বেড়েছে। তাঁরা বলেছেন, জরুরিভিত্তিতে এই নিরসরণ কমাতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিকে তাঁরা সন্ধিক্ষণ হিসেবে অভিহিত করেন। বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়ে ১লা ডিসেম্বর বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে হাজার হাজার মানুষ র‍্যালি করে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় প্যারিস চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানায়। বিশ্বব্যাংকও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দেশগুলোকে সাহায্য করার জন্য আগামী ৫ বছরে ২০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করার ঘোষণা দিয়েছে। বিগত জলবায়ু সম্মেলনগুলোর সাবেক সভাপতিরা এক যৌথ বিবৃতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় নেয়া পদক্ষেপগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'সময় যত পার হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ততই ভয়াবহভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠছে সবার সামনে।

কপ (কনফারেন্স অব পার্টিস)-২৪ সম্মেলন

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মারা যাচ্ছে গর্ভের সন্তান

নতুন এক অনুসন্ধান নিয়ে হাজির হয়েছেন গবেষকরা, তারা বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার নারীদের গর্ভের সন্তান মারা যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। কারণ মাটিতে বাড়ছে লবণাক্ততার পরিমাণ, ফসল নষ্ট হচ্ছে, মরে যাচ্ছে মিঠা পানির মাছ, কমছে বিশুদ্ধ খাবার পানি। সেই লবণাক্ত পানি খাওয়ার কারণে বাড়ছে রোগ আর গর্ভের সন্তান মৃত্যুর ঝুঁকি। এ প্রভাব পড়ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়ও।

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় একটি গ্রামে নারীদের গর্ভের সন্তান নষ্ট হওয়ার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় গবেষকরা অনুসন্ধান শুরু করেন। সেখানে অনুসন্ধানে যান *বিবিসি*'র সাংবাদিক সুজানাহ স্যাভেজও। *বিবিসি*'র প্রতিবেদনে বলা হয়, পূর্ব উপকূলে একটি গ্রামে বাস করেন আলমুন নাহার। তার তিনটি পুত্রসন্তান আছে। কন্যার আশায় আবারও গর্ভধারণ করেছিলেন। কিন্তু গর্ভেই সন্তান মারা যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামের চেয়ে গর্ভে সন্তান নষ্ট হওয়ার বিষয়টি এখানে অনেক বেশি। এজন্য জলবায়ু পরিবর্তনকেই দায়ী করেছেন তাঁরা।

আইসিডিডিআরবি-এর বিজ্ঞানী ড. মানজুর হানিফি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব জমিতে দেখা যায় কিন্তু মানবদেহে এর প্রভাব দৃশ্যমান না। বিগত ৩০ বছর ধরে কক্সবাজারের চকরিয়ার কয়েকটি এলাকায় স্বাস্থ্য কার্যক্রম ও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে আইসিডিডিআরবি। যারা সমুদ্র থেকে দূরে থাকেন তাদের বাচ্চা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম। ২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত পাহাড় ও সমতল অঞ্চলে ১২ হাজার ৮৬৭ জন গর্ভবতী নারীকে পর্যবেক্ষণ করেছে আইসিডিডিআরবি।

এছাড়া চকরিয়া থেকে মতলব অঞ্চল পর্যন্ত আইসিডিডিআরবির পর্যবেক্ষণে থাকা এলাকাগুলোতে এ পার্থক্য স্পষ্ট। গর্ভে থাকা শিশুমৃত্যুর হার চকরিয়ায় ১১ শতাংশ মতলবে ৮। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই পার্থক্যের মূল কারণ হচ্ছে লবণাক্ত পানি। আর সেটার জন্য দায়ী জলবায়ু পরিবর্তন।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

দুর্ঘটনা রোধে সড়ক পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সড়ক পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের নেওয়া কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সড়ক পরিবহণ উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে সড়ক মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে অন্তত ২০টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২২টি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে নিষিদ্ধ তিন চাকার যানবাহন চলাচল বন্ধে আরো কঠোর হওয়াসহ ৮০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে কোনো অবস্থাতেই গাড়ি চালাতে না চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বেপরোয়া গতিতে চলা যানবাহন নিয়ন্ত্রণে স্পিড গান কেনারও সুপারিশ করা হয়েছে বৈঠকে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর পরই সিদ্ধান্তের চিঠি পাঠানো হয় সকল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। টঙ্গি থেকে জয়দেবপুর চৌরাস্তা যেতে ২০ মিনিটের কম সময় লাগছে। উল্লেখ্য, এই মহাসড়কে তিন চাকার যানবাহন চলাচল ইতোমধ্যে বন্ধ করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

৮৮টি সড়ক মোড়ে আধুনিক ট্রাফিক সিগন্যাল বাতি

যানজট নিরসনে ২০০১-২০০২ অর্থবছরে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট' প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৮টি সড়ক মোড়ে আধুনিক ট্রাফিক সিগন্যাল বাতি বসানো হয়। নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (কেইস) প্রকল্পের মাধ্যমে সিগন্যাল বাতিগুলো স্থাপন করে সিটি করপোরেশন। এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয় ২০১৪ সালের জুনে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে এই সিগন্যাল বাতিগুলো চালু করার উদ্যোগ নেয় সিটি করপোরেশন। তবে এতে সময়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক পুলিশের কাছে। আপাতত স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালের মাধ্যমে নগরীর ২০টি স্থানে ট্রাফিক কন্ট্রোল চালু করে যানবাহন চালকদের জানিয়ে দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

কুষ্টিয়াবাসীর স্বপ্নের বাইপাস সড়ক

১লা নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়ক উদ্‌বোধন করেন। এ সড়ক উদ্‌বোধনের মধ্য দিয়ে শহরের যানজট, দুর্ঘটনা হ্রাসসহ কুষ্টিয়াবাসীর দীর্ঘ দুই যুগের দুর্ভোগ লাঘব হবে।

চট্টগ্রাম-দোহাজারী লাইনে নতুন ট্রেন

উত্তর-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলা শহরের পণ্য যাত্রীবাহী পরিবহণ পাবনা-কুষ্টিয়া এবং কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ-মজমপুর গেট মোড় হয়ে কুষ্টিয়া জেলার আঞ্চলিক মহাসড়ক দিয়েই চলাচল করত। তাই এ অঞ্চলের মানুষের প্রাণের দাবি ছিল বাইপাস সড়ক। জানা যায়, ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় জাতীয় সংসদ অধিবেশনে তৎকালীন কুষ্টিয়ার সংসদ সদস্যরা জেলার সমস্যা, সম্ভাবনা ও উন্নয়নকল্পে করণীয় বিষয়ের ওপর বক্তব্য দিতে গিয়ে বাইপাস সড়ক নির্মাণের দাবি উত্থাপন করেন। এরপর বিষয়টি নিয়ে কোনো অগ্রগতি লক্ষ করা যায়নি। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাইপাস সড়ক নির্মাণে উদ্যোগী হয়। ২০১৪ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাহবুব-উল-আলম হানিফ সংসদ সদস্য হওয়ার পর এসব দাবি নিয়ে বেশ জোরশোরেই আলোচিত হতে থাকে।

২০১৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বর মজমপুর গেটে মোটর শ্রমিকদের এক সংবর্ধনায় সংসদ সদস্য মাহবুব-উল-আলম হানিফ কুষ্টিয়া বাইপাস সড়ক নির্মাণের কাজ শুরুর ঘোষণা দেন। সে অনুযায়ী ২০১৭ সালের ২৮শে জানুয়ারি কুষ্টিয়া সড়ক ও জনপথ বিভাগ মনিকো লিমিটেড নামক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে বাইপাস সড়ক নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ দেন। এরপর ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কুষ্টিয়া শহরতলি কারখাদা ত্রিমোহী বারখাদা হাটের পশ্চিম পাশ থেকে বটতৈল মোড় পর্যন্ত ৬ দশমিক ৬ পয়েন্ট সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু করে। গত ৭ই অক্টোবর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নির্মাণকাজ শেষে জেলা সড়ক ও জনপথ বিভাগকে বুঝিয়ে দেয়।

এ ব্যাপারে কুষ্টিয়া সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম জানান, সড়কটি নির্মাণে কোনো ত্রুটি নেই। ত্রিমোহনী কারখাদার হাটের পশ্চিম পাশ থেকে গোবিন্দপুর, মালাকারপাড়া হয়ে বটতৈল গিয়ে ৬.৬ কিলোমিটার দূরত্বের বাইপাস সড়কটি কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ সড়কে গিয়ে মিলিত হয়েছে। এই সড়কে ১৪৩ মিটার একটি রেলওয়ে ওভারব্রিজ, একটি ৪৮ মিটার ব্রিজ ও ৩৩টি কালভার্ট রয়েছে। কুষ্টিয়া বাইপাস সড়কটি নির্মাণ হওয়ায় এ অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হলো।

চট্টগ্রাম-দোহাজারী লাইনে নতুন ট্রেন চালু

চট্টগ্রাম-দোহাজারী লাইনে নতুন একজোড়া ট্রেন চালু হয়েছে। এখন থেকে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন এই লাইনে দুইজোড়া ট্রেন চলাচল করবে। এতে দীর্ঘদিনের যাতায়াতের ভোগান্তিও কমবে। রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম থেকে বেলা ১১টায় ছেড়ে দোহাজারী পৌঁছবে বেলা ২টায়। আবার দোহাজারী থেকে বিকাল ৩টায় ছেড়ে সন্ধ্যা ৬টায় চট্টগ্রাম আসবে। চট্টগ্রাম থেকে সন্ধ্যা ৭টায় ছেড়ে ১০টায় পৌঁছবে দোহাজারীতে। পরের দিন ভোরে দোহাজারী থেকে সাড়ে ৬টায় ছেড়ে চট্টগ্রাম পৌঁছবে সকাল সাড়ে ৯টায়। প্রতি শুক্রবার একজোড়া ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে। রেলওয়ে ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম থেকে দোহাজারী পর্যন্ত প্রায় ৪৭ কিলোমিটার পথটি রেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ লাইন। এক সময় প্রতিদিন সকাল-বিকাল ৪ জোড়া ট্রেনের নিয়মিত চলাচল ছিল। লোকসানের অজুহাত তুলে ৯০ দশকের দিকে একে একে বন্ধ করে দেওয়া হয় সব লোকাল ট্রেন। এতে দক্ষিণ চট্টগ্রামের হাজার হাজার যাত্রীকে প্রায় ২ যুগেরও বেশি সময় ধরে চরম দুর্ভোগে যাতায়াত করে আসছে। দীর্ঘদিন ধরে এ লাইনে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি ছিল সাধারণ মানুষের।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদক পাচার বন্ধে কাজ করছে পুলিশ

মাদকের চোরাচালান বন্ধে কঠোর হওয়ার কথা জানিয়ে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) জাবেদ পাটোয়ারী বলেছেন, অবশ্যই কক্সবাজারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রয়েছে। সবাই জানি এই কক্সবাজার দিয়েই মাদকের একটি বড়ো অংশ সারাদেশে যাচ্ছে। এটি বন্ধ করতে কার্যকরভাবে আমরা কাজ করছি। আশা করি, আমরা সফল হব। ১৮ই নভেম্বর অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন কক্সবাজারের চকরিয়া থানায় নবনির্মিত চারতলা ভবন উদ্‌বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। আইজিপি বলেন, কক্সবাজার থেকেই মাদকের একটি বড়ো অংশ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রধানমন্ত্রী দেশকে মাদকমুক্ত করার জন্য জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা দিয়েছেন। পুলিশ এই নীতি বাস্তবায়নে দেশে এর প্রয়োগ ঘটাচ্ছে।

মাদকের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান

মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। গত ৪ঠা মে থেকে চলছে সাঁড়াশি অভিযান। গত ১০ মাসে মাদকের সঙ্গে

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ১লা ডিসেম্বর ২০১৮ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে বিশ্ব এইডস দিবসে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

জড়িত প্রায় দেড় লাখ মানুষ গ্রেফতার হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মে মাস থেকে দেশজুড়ে শুরু হয় মাদকবিরোধী সাঁড়াশি অভিযান।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

ডিসেম্বরেই ৭ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ পাবেন

ডিসেম্বরের মধ্যেই ৭ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ পাবেন। সারাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নে আমরা যে ৭ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলাম তা ডিসেম্বরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে। এ চিকিৎসকরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করবেন। ১১ই নভেম্বর মহাখালীর বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস) মিলনায়তনে 'ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অব থ্যালাসেমিয়া' বিষয়ক সেমিনারে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এসব কথা বলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষার যে কথা উচ্চ আদালত বলেছে তা মানা উচিত। এতে সংকোচ বা লজ্জার কিছু নেই। এতে থ্যালাসেমিয়ার প্রকোপ কমবে। দেশের সব থ্যালাসেমিয়া রোগীর নিবন্ধন সরকার করবে বলেও মন্ত্রী অনুষ্ঠানে জানান।

ভেজাল ওষুধ তৈরি করলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ভেজাল ওষুধ তৈরি, মজুত ও বিক্রি করেন তাহলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০ লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রেখে দেশে 'ওষুধ আইন ২০১৮' প্রণয়ন করছে সরকার। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ আইনটি চূড়ান্ত করে আইন মন্ত্রণালয়ের ভ্যাটিংয়ের জন্য পাঠিয়েছে বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়।

চূড়ান্ত খসড়ায় বলা হয়েছে, চিকিৎসকরা ব্যবস্থাপত্রে অনিবন্ধিত কোনো কোম্পানির ওষুধ লিখতে পারবেন না। ওভার দ্য কাউন্টার (ওটিসি) ওষুধ ছাড়া রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ব্যতিরেকে অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধসহ বিভিন্ন ওষুধ বিক্রি করা যাবে না। এমনকি ব্যবস্থাপত্র ছাড়া খুচরা কোনো ওষুধও বিক্রি করা যাবে না। যিনি এ বিধান উপেক্ষা করবেন তার সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

বিশ্ব এইডস দিবস পালন

২০৩০ সাল নাগাদ দেশ থেকে এইচআইভি/এইডস নির্মূলের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বাংলাদেশ তা অবশ্যই অর্জন করতে পারবে। মাদক থেকে যুবসমাজকে দূরে রাখতে হবে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। ১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে সরকারের জাতীয় এইডস/এসডিটি কর্মসূচি আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, দেশে প্রথম এইডস রোগী শনাক্ত হয় ১৯৮৯ সালে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত ৬ হাজার ৪৫৫ জন এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছে ১ হাজার ২২ জন। ঘাতক ব্যাধি এইডস নির্মূলে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই দিবসটি উপলক্ষে দেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচি পালিত হয়। সংসদ ভবনের সামনে থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে এইডস দিবসের সূচনা করে স্বাস্থ্য অধিদফতর।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

চাকরিতে প্রতিবন্ধীদের রক্ষায় নীতিমালা হচ্ছে

সরকারি চাকরিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠীসহ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, 'কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল। কিছুদিন পর পরই এই আন্দোলন হয়। সে জন্য আমরা কোটা পদ্ধতি বাতিল করে দিয়েছি এটা ঠিক। তবে, আমরা একটা নীতিমালা তৈরি করছি'।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'প্রতিবন্ধী, সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠী বা অনগ্রসর জাতি- তারা যেন যথাযথভাবে চাকরি পায় এবং চাকরিতে তাদের অধিকার নিশ্চিত হয় নীতিমালায় সেই ব্যবস্থাটা অবশ্যই করা হবে'।

৩রা ডিসেম্বর, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২৭তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং ২০তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কথা বলেন।

১৯৯৬ সালে সরকারে আসার পর থেকেই প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষায় তাঁর সরকার কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মানুষ হিসেবে তাদের প্রাপ্য অধিকারটা আমরা যেন দিতে পারি এবং তাদের ভেতরে যে শক্তি আছে সেটাকে আমরা যেন কাজে লাগাতে পারি, সেটাই আমাদের লক্ষ্য'।

প্রতিবন্ধীদের জন্য কল্যাণ ফাউন্ডেশন তৈরি এবং তাদের মধ্যে যারা খেলাধুলায় সম্পৃক্ত তাদের বিশেষ অলিম্পিকে সম্পৃক্ত করাসহ আরো নানা ধরনের সুযোগের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তারাই আমাদের জন্য স্বর্ণ জয় করে আনছে, এর মাধ্যমেই বোঝা যায় তাদের সুপ্ত প্রতিভাটা। কাজেই আমাদের দেশের কাজেও তারা লাগতে পারে'।

'সাম্য ও অভিন্ন যাত্রায় প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়ন' শীর্ষক প্রতিপাদ্য দিয়ে সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা ডিসেম্বর ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে '২৭তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২০তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন–পিআইডি

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন সভাপতিত্ব করেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জিল্লার রহমান এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সভাপতি সায়েদুল হকও অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' এবং 'নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩' নামে দুটি আইন পাস করে। ইতোমধ্যে এর বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, যত স্থাপনা হবে প্রতিটি জায়গায় প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যেন থাকে, সেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ টয়লেটের ব্যবস্থাসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সব স্থানে তাদের জন্য যেন সুযোগ-সুবিধা থাকে, সেই নির্দেশনা দেওয়া আছে।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় দুই ঈদ, বাংলা ও ইংরেজি নববর্ষ এবং বড়দিন উপলক্ষে যে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠান, তা এই প্রতিবন্ধীদের আঁকা ছবি দিয়েই করা হয় বলেও উল্লেখ করেন।

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব শিশু দিবসে মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদান

শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করায় ৫০ জন গণমাধ্যমকর্মীকে সম্মাননা দিয়েছে ইউনিসেফ। ২০শে নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবসে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদের প্রদান করা হয় 'মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০১৮'। এ বছর মীনা পুরস্কারের জন্য ৮৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। ১৪ ক্যাটাগরিতে মনোনীত ৮৫ জনের মধ্যে থেকে বিজয়ী ৫০ জনকে বেছে নেওয়া হয়। গতবছর এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৭০০ জন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ছিল বর্ণিল সাংস্কৃতিক আয়োজন। শিশুদের জন্য সৃজনশীল ও সাংবাদিকতায় অবদানের স্বীকৃতি দিতে ইউনিসেফ এই মীনা অ্যাওয়ার্ড চালু করেছে। প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক, রেডিও ও অনলাইন মাধ্যমে কর্মরত ব্যক্তিদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়। মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডে অংশগ্রহণকারী ও পুরস্কার বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান ইউনিসেফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি অ্যাড্রিয়ার্ডে বেগবেদার। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, শিশুদের সমস্যাগুলো তুলে ধরে এবং শিশুদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর মাধ্যমে বাংলাদেশের গতিশীল গণমাধ্যম ও শিশুদের বৈশ্বিক কর্মকাণ্ডে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।

অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট, পুরস্কারের অর্থ ও সনদ তুলে দেন ইউনিসেফ বাংলাদেশের শুভেচ্ছা দূত অভিনেত্রী মৌসুমী ও জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ।

শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠান করল ইউনিসেফ

২০শে নভেম্বর সারাবিশ্বে পালিত হয় বিশ্ব শিশু দিবস। দিবসটি উপলক্ষে ইউনিসেফ ১৬ই নভেম্বর ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ মাঠে আয়োজন করে শিশুদের জন্য মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী। অগণিত শিশুর কোলাহলে মেতে ওঠে প্রাঙ্গণ। মেলার মঞ্চে উঠেন ইউনিসেফের শুভেচ্ছা দূত চিত্রনায়িকা মৌসুমী। দর্শক সারিতে বসা শিশুদের সাথে গল্পে মেতে ওঠেন। এ সময় মৌসুমী শিশুদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা যারা ভালো আছো, তারা ভালো থেকো, কিন্তু যারা ভালো নেই, তাদের কথাও ভেবো। যারা শিক্ষা পায় না, খাদ্য পায় না, যারা সুবিধাবঞ্চিত– তাদের জন্য তোমরা কী করবে তা এখন থেকেই পরিকল্পনা কর।

অনুষ্ঠানে ইউনিসেফের শুভেচ্ছা দূত জাদু শিল্পী জুয়েল আইচ মুঠোফোন ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে শিশু ও অভিভাবকদের সাবধান করেন। খারাপ দিক বর্জন করে জীবন

সাজানোর কাজে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার আহ্বান জানান তিনি। ইউনিসেফের ইয়ুথ অ্যাডভোকেট রাবা খান বিচিত্র সব প্রশ্নের মাধ্যমে শিশুদের সচেতন করার প্রয়াস চালান। তিনি বাল্যবিয়ে বন্ধে জরুরি সেবা পেতে ৯৯৯ নম্বর সম্পর্কে শিশুদের শিক্ষা দেন।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির ২১ বছর পূর্তি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে গড়ে ওঠা এক জনপদ পার্বত্য চট্টগ্রাম। এ অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বর্ণিল জীবনাচার, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এ অঞ্চলকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি। কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সরকারের পক্ষে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ও উপজাতিদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় ওরফে সন্তু লারমা এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ঐতিহাসিক এ চুক্তির ২রা ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে ২১ বছর পূর্তি হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির একুশ বছর পূর্তিতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী প্রদানের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসমূহের জনগণ ও দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব। আওয়ামী লীগ সরকার শান্তিচুক্তির আলোকে এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করেছি। তিনি বলেন, এ অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ সব খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরা রাঙামাটিতে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছি। ভূমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের পদক্ষেপের ফলে আজ পার্বত্য জেলাগুলো কোনো পিছিয়ে পড়া জনপদ নয়। দেশের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এ অঞ্চলের জনগণ সম-অংশীদার। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র শান্তি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

অনগ্রসর ও অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া শান্তি ও উন্নয়নের ধারা যে অব্যাহত রয়েছে তারই স্বীকৃতির স্মারক হচ্ছে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার অর্জন বলে মনে করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪ প্রণয়ন করেছে। পার্বত্য এলাকার নারীদের স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চার হাজার পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে এ অঞ্চলের নারী ও শিশুদের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় বর্ণমালা সংরক্ষণ এবং নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষাদানের কাজ শুরু হয়েছে। ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্যবাসীর স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে প্রায় দুই একর জমির ওপর ১৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে 'শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স' নির্মাণ করা হয়েছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে ২৭শে নভেম্বর ২০১৮ রবীন্দ্র উৎসবে অতিথিরা শিল্পী ফাহমিদা খাতুনকে রবীন্দ্র একাডেমি সম্মাননা-১৪২৫ স্মারক প্রদান করেন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীর ৪২ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন

গণসংগীতের সংগঠন ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীর পার হলো ৪২টি বছর। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও প্রাতিষ্ঠানিক বার্ষিকীতে সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় ৩৮ গুণীকে সম্মাননা দিয়েছে সংগঠনটি। ২৪শে নভেম্বর শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্যকলা ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ঋষিজের ৪২ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণসংগীত শিল্পী ফকির আলমগীর। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মুহাম্মদ সামাদ। অনুষ্ঠানটি উৎসর্গ করা হয় প্রয়াত সাংবাদিক গোলাম সরওয়ার ও প্রয়াত ব্যান্ড সংগীত শিল্পী আইয়ুব বাচ্চুকে।

জাদুঘরে রবীন্দ্র উৎসব

রবীন্দ্র একাডেমি ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে ২৭শে নভেম্বর শুরু হয় দুইদিনের রবীন্দ্র উৎসব। এ উৎসবে ছিল রবীন্দ্র সম্মাননা, রবীন্দ্রনাথের কর্মভিত্তিক পাঁচটি ভিন্ন বিষয়ে সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উৎসবের উদ্‌বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র গবেষক আহমদ রফিক এবং রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ফাহমিদা খাতুনকে 'রবীন্দ্র একাডেমি সম্মাননা-১৪২৫' দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী, বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহাম্মদ সামাদ।

সমকালীন নৃত্য উৎসব

সমকালীন শিল্পে প্রতিদিনই নতুনত্ব যোগ হচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের তরুণরাও সমকালীন শিল্পচর্চায় এগিয়ে যাচ্ছে। শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় ২৯শে নভেম্বর জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আয়োজনে জাতীয় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে দুই দিনব্যাপী সমকালীন নৃত্য উৎসবের উদ্‌বোধন করেন জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক কার্স্টেন হ্যাকেনব্রক। ২০১৬ সাল থেকে চালু হওয়া 'ইয়াং কোরিওগ্রাফার প্লাটফর্ম' প্রকল্পের ধারাবাহিক আয়োজন এটি। জার্মানের নৃত্য পরিচালক টমাস বুঞ্জার কয়েক সপ্তাহব্যাপী শিল্পকলায় কর্মশালা পরিচালনা করেন। এর চূড়ান্ত রূপ এটি।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র: হাসিনা অ্যা ডটার'স টেল

প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু কন্যাকে নিয়ে নির্মাতা পিপলু খান নির্মাণ করেন 'হাসিনা: অ্যা ডটারস টেল'। ৭০ মিনিট দৈর্ঘ্যের ছবিটি নির্মাণ করতে পরিচালকের সময় লেগেছে প্রায় পাঁচ বছর। দুই বছরের গবেষণা ও তিন বছরের নিরলস প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছে এই ডকু-ড্রামা। ১৬ই নভেম্বর ছবিটি ঢাকায় বসুন্ধরা সিনেপ্লেক্স, যমুনা ব্লকবাস্টার, মধুমিতা আর রাজধানীর বাইরে চট্টগ্রামের মিনিপ্লেক্সে মুক্তি পায়।

চলচ্চিত্রটির সিনেমাটোগ্রাফার করেন সাদিক আহমেদ, সম্পাদনায় ছিলেন নবনীতা সেন এবং সংগীতে আছেন ভারতের বিখ্যাত মিউজিশিয়ান দেবজ্যোতি মিশ্র– এই চলচ্চিত্রটির কাহিনি মূলত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবনের দুঃখ-বিষাদ, ব্যক্তিগত আখ্যান, আর নৈকট্যের গল্পগুলোকে তুলে ধরেছেন তার নিজস্বতায়।

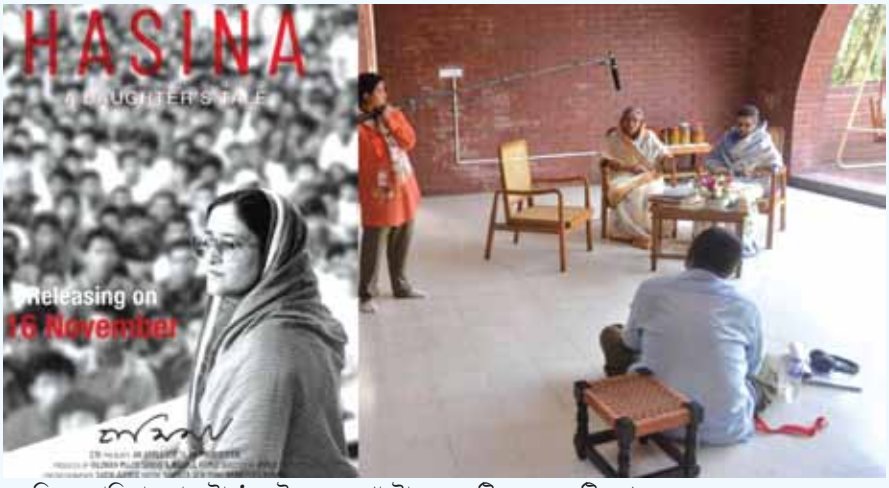

চলচ্চিত্র: হাসিনা অ্যা ডটার'স টেল-এর পোস্টার ও স্যুটিংয়ের একটি দৃশ্য

চলচ্চিত্র 'মিস্টার বাংলাদেশ'

নির্মাতা আবু আক্তারুল ইমাম নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র 'মিস্টার বাংলাদেশ'। এ ছবির কাহিনি মূলত– সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এতে অভিনয় করেন– লাক্স সুন্দরী শানারেই *দেবী* শানু ও খিজির হায়াত খান।

কানাডায় দেবী প্রদর্শিত

আন্তর্জাতিক পরিবেশক স্বপ্ন স্কেয়ারক্রোর পরিবেশনায় সিনেপ্লেক্সে এন্টারটেইনমেন্ট চেইনে দেবী কানাডার দুটি শহর টরন্টো ও মিসিসাগাতে দুটি প্রেক্ষাগৃহে মোট ৫২ শো প্রদর্শিত হয়। কানাডার আরো ৪টি শহরে উইনিপেগ, এডমন্টন, ক্যালগেরি, সারে (ভ্যান-কুভার)-এ সিনেপ্লেক্স এন্টারটেইনমেন্টে লোকেশনে *দেবী* মুক্তি পায় ৩০শে নভেম্বর।

সর্বকালের সেরা বিদেশি ছবি 'পথের পাঁচালী'

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নানান ভাষার সেরা ১০০ চলচ্চিত্র বাছাই করল ব্রিটিশ গণমাধ্যম *বিবিসি*। ২০৯ দেশের ৪৩ জন বোদ্ধার ভোটে তৈরি হয়েছে এই তালিকা। এতে ১৫ নম্বরে আছে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী। বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত প্রথম ছবি এটি। *বিবিসির* তালিকায় একমাত্র বাংলা ছবি ১৯৫৫ সালের ৩রা মে মুক্তি পাওয়া পথের পাঁচালী মুখ্য চরিত্র অপুর কৈশোরকে কেন্দ্র করে বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে বাংলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের জীবনধারা চিত্রায়িত হয়েছে এতে। এর মাধ্যমে সামাজিক বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে সমান্তরাল ছবির ধারা তৈরি হয় ভারতীয় চলচ্চিত্রে। পথের পাঁচালীর মাধ্যমে প্রথম ভারতীয় ছবি আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করে।

তিন শিল্পীকে প্রধানমন্ত্রীর অনুদান

অভিনেত্রী মিনু মমতাজ, কেয়া ইসলাম ও আইরিন অধিকারীকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ২৯শে নভেম্বর ৫ লাখ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়। এ বছরের প্রথমদিকে এই তিন শিল্পীর দুরবস্থার কথা *বাংলাদেশ প্রতিদিনের* শোবিজ বিভাগে প্রকাশ করা হলে তা সরকারের নজরে আসে। এই তিন অসুস্থ শিল্পী চলচ্চিত্র, টেলিভিশন , মঞ্চ ও গানের শিল্পী কলাকুশলীদের সংগঠন শিল্পী ঐক্যজোটের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর চিকিৎসা সহায়তার জন্য আবেদন করেন। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এ অনুদান দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করে বাংলাদেশের ইতিহাস

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্ট জয়ের পর ২রা ডিসেম্বর ঢাকায় মিরপুর টেস্টেও দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে টাইগাররা। টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার পর ১৮ বছরে বাংলাদেশের খেলা ১১২টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে প্রথমবার ঢাকা টেস্টে প্রতিপক্ষকে ফলোঅনের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে টাইগাররা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো ক্রিকেট পরাশক্তিকে নিজেদের মাটিতে গুঁড়িয়ে দিয়ে হোয়াইটওয়াশ করেছে টাইগাররা। তবে তার থেকেও দারুণ ব্যাপার হলো, নিজেদের ক্রিকেট ইতিহাসে কোনো নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষ হিসেবে একমাত্র উইন্ডিজদেরই দুইবার টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করার গৌরব অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে টেস্টে সাকিবের নতুন রেকর্ড

২৪শে নভেম্বর এক অনন্য রেকর্ড গড়লেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ২০০ উইকেট পেলেন সাকিব আল হাসান।

টেস্ট ক্যারিয়ারে ৫৪ ম্যাচে ৯১ ইনিংসের মাধ্যমে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে তিনি এ কৃতিত্ব অর্জন করলেন। পাশাপাশি টেস্টে দ্রুততম সময়ে তিন হাজারের বেশি রান ও অন্তত দুইশ উইকেট শিকারি নবম খেলোয়াড় সাকিব। টেস্টে বাংলাদেশি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হলেন মোহাম্মদ রফিক। ৩৩ ম্যাচে ৪৮ ইনিংসে তিনি নিয়েছেন ১০০ উইকেট। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন তাইজুল ইসলাম। ২২ ম্যাচে ৩৯ ইনিংসে তার সংগ্রহে রয়েছে ৮৮ উইকেট। এ তিনজনই বাঁহাতি স্পিনার।

সাকিবের কীর্তি

বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে ২০০ টেস্ট উইকেট। ৩০০০ রান ও ২০০ উইকেটের 'ডাবল' দ্রুততম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেই ক্যারিয়ারের ৫৪তম টেস্টটাকে স্মরণীয় করে রাখলেন সাকিব আল হাসান। সাকিব পেছনে ফেলেছেন ইংল্যান্ডের ইয়ান বোথামকে।

৩০০০ রান ও ২০০ উইকেটে দ্রুততম
৫৪, সাকিব আল হাসান, বাংলাদেশ
৫৫, ইয়ান বোথাম, ইংল্যান্ড
৫৮, ক্রিস কেয়ার্নস, নিউজিল্যান্ড
৬৯, অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ, ইংল্যান্ড
৭৩, কপিল দেব, ভারত

জাতীয় দাবায় চ্যাম্পিয়ন জিয়া

শেষ রাউন্ডে জিতে জাতীয় দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পুরাতন ভবনে গত ৩রা ডিসেম্বর ফিদে মাস্টার মোহাম্মদ তৈয়বুর রহমানকে হারান জিয়া। ১০ রাউন্ডে আট জয় ও এক ড্রয়ে সাড়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ২০১৪ সালের পর সেরা হলেন এই গ্র্যান্ডমাস্টার। জাতীয় দাবায় এটা তাঁর ১৪তম শিরোপা।

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা দলে জাহানারা

নারী টি-২০ বিশ্বকাপের ষষ্ঠ আসরের ফাইনালে গত ২৫শে নভেম্বর ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। এর মধ্য দিয়ে এই আসরে পর্দা নামলো।

টুর্নামেন্ট শেষে প্রমীলা টি-২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেটের প্রধান সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। ১২ জনের দলে দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে জায়গা পেয়েছেন বাংলাদেশের জাহানারা আলম। ১২ জনের দলে সবচেয়ে বেশি খেলোয়াড় রয়েছে ভারত ও ইংল্যান্ড থেকে ৩ জন করে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দু'জন খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়া থেকে। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ-নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে একজন করে খেলোয়াড় আছেন।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

বিশ্বজুড়ে ডিসেম্বর : স্মরণীয় ও বরণীয়

১লা ডিসেম্বর ১৯০০ : বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ কুদরাত এ- খুদার জন্ম
১লা ডিসেম্বর ১৯৯৭ : বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা খান আতাউর রহমানের মৃত্যু
১লা ডিসেম্বর ২০১৮ : বীরপ্রতীক তারামন বিবির মৃত্যু
২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ : বাংলাদেশ সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে 'পার্বত্য শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরিত
৩রা ডিসেম্বর ১৯৮৯ : ভারতীয় উপমহাদেশের বিপ্লবী নেতা ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম
৩রা ডিসেম্বর ১৯৫৫ : বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত
৩রা ডিসেম্বর ১৯৫৬ : কথাসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু
৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৫ : বাংলাদেশের বিখ্যাত ভাস্কর নিতুন কুণ্ডুর জন্ম
৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২৯ : সতীদাহ প্রথা রহিত করেন গভর্নর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং
৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৮৮ : ইতিহাসবেত্তা রমেশ চন্দ্র (আর সি) মজুমদারের জন্ম
৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৩ : গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু
৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'
৫ই ডিসেম্বর ২০১৩ : বর্ণবাদবিরোধী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার মৃত্যু
৬ই ডিসেম্বর ১৮৫৩ : চর্যাপদের আবিষ্কারক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম
৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ : স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ভুটান ও ভারত
৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৫ : সার্ক (SAARC) গঠিত
৯ই ডিসেম্বর ১৯৮০ : নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম
৯ই ডিসেম্বর ১৯৩২ : নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যু
১০ই ডিসেম্বর ১৮৯৬ : নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেলের মৃত্যু
১০ই ডিসেম্ব ১৯৭১ : বীরশ্রেষ্ঠ রুহল আমিন শহিদ হন
১১ই ডিসেম্বর ১৯২৮ : বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা খান আতাউর রহমানের জন্ম
১২ই ডিসেম্বর ১৮৮০ : মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জন্ম
১২ই ডিসেম্বর ১৯৯৬ : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছরমেয়াদি গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত
১৩ই ডিসেম্বর ২০১১ : বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর মৃত্যু
১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১ : পাক হানাদারবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে
১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১ : বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর শহিদ হন
১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৬ : কবি, ঔপন্যাসিক ও শিশুসাহিত্যিক বন্দে আলী মিয়ার জন্ম
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৭ : বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামালের জন্ম
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ : মুক্তিযুদ্ধে বিজয়লাভের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়
১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ : ৩০টি ধারা সংবলিত নারী অধিকার বিষয়ক দলিল CEDAW স্বাক্ষরিত
১৯শে ডিসেম্বর ১৯১২ : মুসলিম ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেনের মৃত্যু
২০শে ডিসেম্বর ২০১০ : বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর নতুন নামকরণ করা হয় 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ'
২০শে ডিসেম্বর ২০১৪ : বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলমের মৃত্যু
২৩শে ডিসেম্বর ১৯৭১ : স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা
২৫শে ডিসেম্বর ১৮৭৬ : পাকিস্তানের জনক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর জন্ম
২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৪ : ঢাকা থেকে প্রথম টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু
২৬শে ডিসেম্বর ১৫৫৩ : মুঘল সাম্রাজের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের মৃত্যু
২৭শে ডিসেম্বর ১৮২২ : ফরাসি অনুজীব বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের জন্ম
২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৫ : সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের জন্ম
২৭শে ডিসেম্বর ২০০৭ : বিশ্বের প্রথম মুসলিম নারী প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টো আততায়ীর গুলিতে নিহত
২৯শে ডিসেম্বর ১৯১৪ : দেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিনের জন্ম
২৯শে ডিসেম্বর ১৯৯৩ : প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক আবদুল জব্বার খানের মৃত্যু
৩০শে ডিসেম্বর ১৯৫৯ : 'বাংলা সুরসম্রাট' হিসেবে খ্যাত লোকসংগীত শিল্পী আব্বাস উদ্দিনের মৃত্যু।

জয়নুল আবেদিন

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন ১৯১৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর পিতার কর্মক্ষেত্র বৃহত্তর ময়মনসিংহের কেন্দুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা তমিজুদ্দীন আহমদ পুলিশ বিভাগের জমাদার ছিলেন। আদি নিবাস পাবনাতে হলেও জীবিকার প্রয়োজনে তাঁর প্র-পিতামহ ময়মনসিংহ জেলায় স্থানান্তরিত হন। জয়নুল আবেদিন ময়মনসিংহ মৃত্যুঞ্জয় হাইস্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। এ ইনস্টিটিউশনে পঞ্চম বর্ষে অধ্যয়নকালে কলকাতা জাদুঘরে সর্বভারতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এক চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁর ছয়টি জলরঙের চিত্র প্রদর্শিত হলে ৬টিই শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে গৃহীত হয় এবং 'গভর্নরস গোল্ড মেডেল' পুরস্কার লাভ করে। ১৯৩৮ সালে ফাইন আর্টসে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। একই বছরে তিনি কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৩৫০ (১৯৪৩ খ্রি.)-এর দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের স্কেচ এঁকে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা আর্ট স্কুল (বর্তমানে চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট) প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অতঃপর সরকারের তথ্য বিভাগের প্রধান শিল্পী নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সালের ১লা মার্চ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে ঢাকা আর্ট কলেজের ছাত্ররা তাঁকে শিল্পাচার্য উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৭১-এ তিনি পাকিস্তান সরকারের 'হেলালে ইমতিয়াজ' উপাধি বর্জন করেন। এ সময় মার্চে অসহযোগ আন্দোলনে দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেন। ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর এবং ১৯৭৪ সালে জাতীয় অধ্যাপক পদে পদায়ন লাভ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতি ও মানুষ তাঁর চিত্রের প্রধান আকর। কালো কালির বলিষ্ঠ রেখায় নিপীড়িত, শ্রমজীবী ও সংগ্রামী মানুষের চিত্র অঙ্কন করে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। দুর্ভিক্ষ ছাড়াও তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে *নবান্ন, মনপুরা-৭০, বিদ্রোহ* ইত্যাদি। এ পর্যন্ত তাঁর অঙ্কিত ১১৫০টি ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৯৭৫ সালে ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠিত জয়নুল আবেদীনের সংগ্রহশালায় ৭০টি ছবি সংরক্ষণ করা হয়। জাতীয় জাদুঘরে জয়নুল আবেদিন গ্যালারিতে তাঁর আঁকা ৭০০ ছবি স্থান পেয়েছে। কর্মজীবনে তিনি 'প্রাইড অব পারফরমেন্স (১৯৫৯) পুরস্কার লাভ করেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক 'ডি-লিট' উপাধি প্রদান করে।

১৯৭৬ সালের ২৮শে মে ঢাকায় ক্ষণজন্মা এ শিল্পী ফুসফুসের ক্যানসার রোগে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রতিবেদন: নাসরিন নিশি